হরি সাধন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ

প্রণীত।

৪৬ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট

ষ্টার লাইব্রেরী হইতে

পাল এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৬নং সিমুলিয়া ষ্ট্রীট—রামায়ণ যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ। ১২৯৭।

সূচী।

সূচনা।

প্রথম ভাষ।

দ্বিতীয় ভাষ।

তৃতীয় ভাষ।

হরিসাধনের উপায় কি? হরিসাধন—কিরূপে সাধন হয়? -চিত্তশুদ্ধি কি?—গীতার সাহায্যে চিত্তশুদ্ধির স্পষ্টী করণ।

চতুর্থ ভাষ।

হরি সাধনের ফল।----মুক্তি কি?--হরির ধর্ম্ম কথন।----বেদের সাহায্যে সৃষ্টির পূর্ব্বকাল বর্ণন।--ক্রম বিকাশ--সৃষ্টি ও স্রষ্টের আভ্যন্তরিক শারীরিক ও মানসিকাদি অবস্থাবিপর্য্যয়। অবতারগণের কার্য্য ও দশ—অবতারের সহিত দশ মহাবিদ্যার সামঞ্জস্য।--দশ মহাবিদ্যার--বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

পঞ্চম ভাষ।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা।--কংশবধ।--পুতনা বধ।-রাসলীলা, ব্রজলীলা।---বলাসন বধ।---বিষ্ণুর ধ্যানে কৃষ্ণ চরিত্র--প্রস্ফুরণ। গোবর্দ্ধন ধারণ।—নবনীত হরণ।--বলরাম কে!—বস্ত্রহরণ।—কৃষ্ণকালী।—এ সমস্ত ঘটনা মহাভারতে আছে কি না।--বেদ-ব্যাসের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন।

ষষ্ঠ ভাষ।

হিরণ্য কশিপুর--যোগ সাধন।--প্রহ্লাদের জন্ম--শিক্ষা--দীক্ষা। কারাগারে—প্রহ্লাদ!--হস্তি পদতলে—প্রহ্লাদ!--

বিষপানে-প্রহ্লাদ !--সমুদ্র গর্ভে প্রহ্লাদ ! শ্মশানে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমাঝে--প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের-ধর্ম্ম প্রচার।--নৃসিংহ মূর্ত্তির আবির্ভাব।---হিরণ্যকশিপুনিধন।--প্রহ্লাদের---ভক্তিযোগ। সকাম ও নিষ্কাম সাধনার প্রকৃষ্টতা প্রতিপাদন.

সপ্তম ভাষ।

অরণ্যে বালকগণ ও ধ্রুব।—ধ্রুবের পিতৃ দর্শন। বিমাতৃ নিগ্রহ।—ধ্রুব সাধন। দেবর্ষী নারদ।—ধ্রুবের দীক্ষা। অপ্সরা সমাগম।—উন্মত্ত ধ্রুব। অগ্নিপতনোন্মুখ ধ্রুব। পদ্মপলাশলোচন হরির সাক্ষাৎ[illegible]ব লাভ। ধ্রুবের সিদ্ধিলাভ।—ধ্রুব লোক বর্ণন।

অষ্টম ভাষ।

চৈতন্যের শিক্ষা।—সন্ন্যাস গ্রহণ—তীর্থ পর্য্যটন।—চৈতন্যের জগন্নাথ সন্দর্শন।—ধর্ম্ম প্রচার।—বামাচারি—বৈষ্ণব। জগাই মাধাই উদ্ধার।—জননী সন্দর্শন।—বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার মর্ম্ম। চৈতন্যের ভক্তিযোগ

নবম ভাষ।

বংশাবলী।

দশম ভাষ।

শ্রীমদ্ভগদ্গীতার সার সংকলন।

সম্পূর্ণোয়ং।

হরি সাধন।

সূচনা।

ওঁ তৎসৎ। হরের্নামৈবকেবলং। ও স্বস্তি।

আব্রহ্মস্তম্ভপ্রস্ফুরণ—অথণ্ডব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপবীজ নিরঞ্জন—সচ্চিদানন্দ—জ্যোতির্ম্ময়—পরমাত্মারূপী পরাৎপর—পরমপুরুষের—'হরি' এই বীজাখ্য সুধাময়নাম স্মরণে—সর্ব্বারম্ভে 'জয়' ও 'স্বস্তি' বাক্য উচ্চারণ করিবে।

এই উত্তালতরঙ্গসমাকুল মহাভীষণ মোহ-প্রমাদসঙ্কুল সংসারসমুদ্রে একমাত্র পরিত্রাণকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বময় সেই পরমকারুণীক পরব্রহ্ম ভগবান হরির চরণে, আমাদের কোটী কোটী নমস্কার! যে হরির অলৌকিক শক্তিবলে অনন্ত অম্বুরাশি হইতে স্থলভাগ পৃথগীভূত হইয়া, ক্রম-বিকাশ বলে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব মনুষ্যবাসোপ-যোগী হইয়াছে, যে হরির সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অদৃশ্য বিধানসূত্রে এই গ্রহনক্ষত্রসম্বলিত বিশাল জগত সম্বদ্ধ থাকিয়া স্বকার্য্যসাধনে নিয়ত রত রহিয়াছে; যে অব্যক্ত অননুভবনীয় বিধানাবলীর বলে ষড়্ঋতু

পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইয়া স্বভাবের স্বভাবত্ব রক্ষা করিতেছে; সেই হরির—সেই সর্ব্বভূতস্থ—সর্ব্বজনশরণ্য—বরেণ্যবরপ্রদ— ভূত-ভাবন হরির—চরণে কোটী কোটী নমস্কার; যে হরির কৃপায় পৃথ্বীতলের স্বভাব শৈত্যতা রক্ষা করণার্থ অনন্ত অম্বুরাশি অনন্ত ধরণী পরিবেষ্টন করিয়া অনন্তের অনন্তমহীমা কীর্ত্তন করিতেছে, তাপ রক্ষণার্থ সূর্য্য গগনমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন, যে হরি—প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে, বাহিরে, ঊর্দ্ধে অধোতে, সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বকালে বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই বিশ্বময়, বিশ্বের আধার স্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার করিয়া আমরা 'হরি সাধনের' সেতুস্বরূপ "হরি সাধন" প্রণয়নে নিযুক্ত হইলাম। তাঁহার প্রতি এই বিশ্বের যাবতীয় কার্য্যের কৃতকার্য্যতা ও ফলাফল নির্ভর করিতেছে,—এই ক্ষুদ্র "হরি সাধন" প্রণয়নে কৃতকার্য্যতা ফলাফলও সেই বিশ্বময়ের প্রতি সমর্পণ করিয়া আমরা কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইলাম।

স্বস্তিঃ! স্বস্তিঃ!! স্বস্তিঃ!!!

প্রথম ভাষ।

আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত অবতারকলাপের কার্য্যকলাপ আচারব্যবহার এবং আবির্ভাবকালের স্বাভাবিক ভাবপরম্পরা সামঞ্জস্য করিলে, কেবল একমাত্র কৃষ্ণ অবতার ভিন্ন সকল গুলিরই কার্য্যকলাপে অল্পাধিক পরিমাণে ন্যায়ের অন্যথাচরণ দৃষ্ট হয়। এসকল কথা ক্রমশঃ বিশদ করা যাইতেছে। সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত যে, অবতারত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য কি,—কোন কার্য্য সাধনার্থ ভগবান্ বারম্বার অবতারত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ, স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, সৃষ্টির যাবতীয় কার্য্যই স্বভাবের উপর নির্ভর করিতেছে। স্বভাব নানারূপে নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া সৃষ্ট পদার্থের স্বভাবত্ব রক্ষা করিতেছে। স্বভাবের বৈপরিত্যে অস্বাভাবিকভাব সমুপস্থিত হইয়া সৃষ্টিবিপর্য্যয় সম্পাদন করে, সুতরাং, জগতে একমাত্র স্বভাবদ্বারাই তাবৎ সৃষ্ট সংরক্ষিত হইতে পারে, তবে আর হরির অবতারত্ব গ্রহণের প্রয়োজন কি? এ সম্বন্ধে অগ্রে দেখা যাউক যে, কি কার্য্য সাধনার্থ তাঁহার আবির্ভাব, গীতায় আছে "সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিসমূহের নিরাকরণ, এবং ধর্ম্মের রক্ষণই তাঁহার আগমনের কারণ।" একার্য্য স্বভাবদ্বারা হইতে পারে না,—অথবা অল্প পরিমাণে সাহায্য হইলেও তাহা তাদৃশ ফল প্রসব করিতে পারে না, করিলেও, কোন গুরুতর কার্য্যবিশেষে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। সেই জন্যই স্বভাবের যে স্থানে কোন কার্য্যকারিত্ব দৃষ্ট হয় না, যে কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে সাধন করা স্বভাবের

অতীত, সেই কর্ম্ম সাধনোদ্দেশে, তিনি যুগে যুগে অবতারত্ব গ্রহণ করেন। অনেকে হয় ত বলিবেন যে, অবতারত্ব গ্রহণের যে কারণ এ স্থলে প্রদর্শিত হইল, তাহার সমস্তই স্বভাব দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। সাধুদিগের জন্য স্বর্গ আর অসাধুদিগের জন্য নরক—পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে এবং তাহা স্বভাব দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জীব আপনার কৃতকার্য্যতা অনুসারেই এই স্বর্গ বা নরক প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম ধার্ম্মিকগণ কর্তৃক রক্ষিত এবং ঘোষিত হইয়া থাকে, সুতরাং, সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতির নিরাকরণ এবং ধর্ম্মের সংরক্ষণ বা সংস্থাপন জন্য, কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং প্রকাশ্য ভাবে, ঈশ্বরের উক্ত কার্য্য সমাধা করার কোনও অনিবার্য্য কারণই পরিলক্ষিত হয় না। তদুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, স্বভাবের প্রতি উক্ত কার্য্যভার ন্যস্ত আছে সত্য এবং তাহা স্বভাবদ্বারা সাধিত হইতেছে সত্য, কিন্তু, স্বভাবের কার্য্য অব্যক্ত এবং ক্রমপরিস্ফূর্য্য। স্বভাবের কার্য্য যাহা—তাহা ধীরমন্দে চলিতেছে। যখন দুষ্ক্রিয়াসক্ত জীবগণ জগতের সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করে, কালের-আবর্ত্তনে যখন জগতের ভূরিভাগ অধর্ম্মের সেবক হইয়া জগতের অহিতাচরণ করিতে থাকে, তখন কালবশে সে সমস্ত জীব নীরয়গামী হইলেও সংসারে পাপস্রোতের কোন প্রতিবন্ধক হয় না, জীবগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া নীরয়গামী হইলেও তখনও যাহারা জীবিত থাকে তাহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পায় না, কেননা পাপপন্থা দেখিতে অতীব চাকচিক্যযুক্ত আর ধর্ম্মপন্থা দেখিতে কণ্টকাকীর্ণ, সুতরাং, জগতের অধিকাংশ জীব ধর্ম্মপন্থার অনুসরণ না করিয়া পাপপন্থারই অনুসরণ করে। ধর্ম্ম ও স্বর্গ এবং

অধর্ম্ম ও নরক উভয়েই তাহার চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি পাপপন্থা কুসুমকোমল, সুতরাং জীবগণ পাপেরই আশ্রয়ীভূত হইয়া থাকে। কালবশে পাপীগণের নীরয় ভোগ স্থিরীকৃত থাকিলেও স্বভাব পাপপুণ্যের চিত্র জীবিত জীব হৃদয়ে সম্যক অঙ্কিত করিয়া, পাপ-পন্থা হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সক্ষম হয় না। যখন জগতের এই অবস্থা হয়, অর্থাৎ প্রকৃতীর বৈপরিত্যে উপস্থিতজগতেব ভূয়িষ্ট অনিষ্ট সাধনের সূত্রপাত হয়, অধর্ম্মের সংঘর্ষণে ধর্ম্ম সংকুচিত হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থান করে, অধার্ম্মিকগণ অধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়া জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ এবং অধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া জীবগণকে অধর্ম্মে প্রণোদিত ও উৎসাহিত করিতে থাকে, তখনই স্বয়ং ভগবান অবতারত্ব গ্রহণ করিয়া সেই অধর্ম্মনিরত জনগণকে ধর্ম্মপথে সমানয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগের হৃদয় ফলকে ধর্ম্মের শান্তিময়ী মূর্ত্তি প্রতিভাসিত করেন। যাহারা অধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি, তাহাদিগের জীবন হনন করিয়া, তাহাদিগকে ভীষণ দুর্গতি জালে বিজড়িত করিয়া, তাহাদিগকে দুর্নিমিত্তপ্রপাতে ভীষণ-বিপন্ন করিয়া, অপরকে অধর্ম্মেব ঘোর পরিণাম প্রদর্শন করেন। ধার্ম্মিকগণের রক্ষা সাধন করিয়া তাহাদিগের সম্মান ভূয়িপরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া, পাপপুণ্যের পার্থক্য জনসমাজে প্রস্ফুটিত করেন। ধর্ম্মাত্মা তাঁহাব সমাগমে প্রোৎফুল্ল হইয়া, স্বকীয় জীবন ধন্য মানিয়া, অনুষ্ঠিত বিষয়ে সানন্দহৃদয়ে কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করেন। ধর্ম্মাধর্ম্মের পার্থক্য এবং পরিণাম চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করাইয়া, জীবগণ যাহাতে নিজের মঙ্গলসাধনে সমর্থ হয়, জীবগণ যাহাতে অধর্ম্মপন্থা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ধর্ম্মপন্থার অনুসরণ করে,

সেই জন্যই ভগবান হরি অবতারত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। জগত নিরবচ্ছিন্ন পাপী বা ধার্ম্মিকে পূর্ণ হইলে সংসার নষ্ট হইয়া যায়। সংসার রক্ষা করা হরির প্রধান কার্য্য। সেই কার্য্য সংসাধনার্থই অবতারত্ব গ্রহণ।

অবতারত্ব গ্রহণের কারণ কিয়ৎপরিমাণে বর্ণিত হইল, এক্ষণে আমরা প্রমাণ করিব যে, সকল অবতার হইতে কৃষ্ণাবতারই সম্পূর্ণ। এক কৃষ্ণাবতার ভিন্ন, অন্য কোনও অবতার পূর্ণব্রহ্ম নহেন। কৃষ্ণই পরাৎপর পূর্ণব্রহ্ম, অন্যান্যকে অংশমূর্ত্তি ভিন্ন পূর্ণব্রহ্ম কোনও অংশেই বলা যাইতে পরে না।

বিভিন্ন শাস্ত্রানুসারে কোথাও আঠার কোথাও বাইশ এবং কোথাও বা একুশটী অবতারের উল্লেখ আছে! সর্ব্ববাদীসম্মত অবতার দশটী,—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ বুদ্ধ, এবং কল্কি। এই দশটী অবতার মধ্যে, রাম, কৃষ্ণ এবং বুদ্ধেরই প্রাধান্য অধিক। ইহাঁরাই এই জগতের ভূরি-ভাগ ব্যাপ্ত। পক্ষান্তরে মৎস্য, কূর্ম্ম এবং বরাহ ইহাঁরা জগতের পূর্ব্বভাগে আবির্ভূত হন। যখন জগত অনন্ত নীলাম্বুময় ছিল, যখন বেদবিদ্যাবিশারদ সভ্যতম মানবমণ্ডলী, ভবিষ্যতের ঘনতমসাচ্ছন্ন নিবীড় গুহায় বসতি করিতেছিলেন, যখন জগতের উপরে অনন্ত আকাশ এবং নিম্নে অনন্ত বারীরাশি ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের মনুষ্যবাসোপযোগী হওন কাল পর্য্যন্ত উক্ত অবতার-ত্রয়ের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া অনর্থক পুস্তককলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। ইহাঁদিগের কার্য্যও তাদৃশ গুরুতর নহে। যিনি যত অধিক কার্য্য করিয়াছেন, যাঁহার দ্বারা সংসা

রের যে পরিমাণে কার্য্য সমাধা হইয়াছে, যিনি সংসারে যত প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি সাধারণের সেই পরিমাণে দৃষ্টি আকর্শিত হইয়া থাকে। তাই সর্ব্বাগ্রে আমরা রাম, পরশুরাম, বুদ্ধ এবং কৃষ্ণ চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখাইব, কৃষ্ণই আদর্শ পুরুষ, এবং সেই জন্যই, কৃষ্ণে পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত।

পরশুরামচরিত পর্য্যালোচনা করিলে এমন কোন কারণই দেখিতে পাই না যাহাতে, পরশুরাম অবতার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। যদি আমাদিগের ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে পরশুরামকে আমরা অবতারশ্রেণি হইতে চ্যুত করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না, কিন্তু সে ক্ষমতা আমাদিগের নাই। শাস্ত্রকারগণ কোন্ গুণে তাঁহাকে সে পদবী প্রদান করিয়াছেন বলিতে পারি না, কিন্তু, আমাদিগকে তাহাই মান্য করিয়া চলিতে হইবে, তাঁহাদিগের মত সর্ব্বথা অনুমোদন করিতে হইবে। শাস্ত্র সমূহের মধ্যে কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা দেখিতে পাই। এমন কি, স্থান বিশেষে এতদূর বিসদৃশ ভাবের উপলব্ধি হয় যে, তাহার কোনও প্রকারেই সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। একটী উদাহরণ দিয়া পাঠকগণের সন্দেহ ভঞ্জন করি,—সকলেই জ্ঞাত আছেন, অষ্টাদশ পুরাণ ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত, এবং সকলেই জানেন দশ অবতার ক্রমশঃ এক একটী করিয়া আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। প্রথমতঃ এই যে, পরশুরাম যদি অবতার হইলেন, এবং রামও যদি অবতার হইলেন, তাহা হইলে এই উভয় অবতারের মধ্যে বিরোধ কিজন্য? উভয়েই যদি স্বয়ং বৈকুণ্ঠ বিহারী হরি হইলেন, তাহা হইলে দুই হরিতে রহস্যময় প্রতিদ্বন্দ্বীভাব কেন?

কেহ হয়ত বলিবেন উদাহরণের জন্য, পাপপুণ্যের পার্থক্য দেখাইবার জন্য উভয়ে উভয়ের বিরোধী হইয়াছিলেন। কথার সমর্থন কি করিব, অসারতা পাঠকগণই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকিবেন, অপিচ, পরশুরামের পর রাম, রামের পর কৃষ্ণ, তাহার পর বুদ্ধ এবং তাহার পর কল্কি। পরশুরামের পর তিনটী অবতারের আবির্ভাব হইলে সর্ব্বশেষ কল্কি আবির্ভূত হইবেন, কিন্তু কল্কিপুরাণে দেখিতে পাই, কল্কি পরশুরামের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এ সকল কথার সমন্বয় করা আমাদিগের অসাধ্য।

পরশুরাম অবতার হইলেও তিনি এমন কোন অলৌকিক কার্য্য সাধন করেন নাই, যদ্দ্বারা তিনি রাম বা কৃষ্ণের উপরে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন।

রামাবতার—রাজবতার। কি প্রণালীতে রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে হয়, রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, রাজধর্ম্ম, এই সকল শিক্ষা দিবার জন্য তিনি অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আদৌ শাসন কর্ত্তার অভাব উপলব্ধিমাত্রেই, জগতে শাসন কর্ত্তার আবশ্যকতার সঙ্গে সঙ্গে, শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইল, কিন্তু তাহাতে সম্যক জ্ঞান না জন্মান হেতু, রাজকার্য্য তাদৃশ সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হইতে পারিল না। চারিদিকে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিতে লাগিল, রাজন্যগণ স্ব স্ব অধিকার বৃদ্ধির মানসে বলপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বীগণের প্রবল প্রতিযোগীতায় সৈন্য নাশ, মনস্তাপ, গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়া সংসারের ঘোর অনিষ্ট পরম্পরায় ভীষণবিপর্য্যয় উপস্থিত হইতে লাগিল। সংসার অরাজকতায় পূর্ণ এবং অতিতূর্ণই সৃষ্টি নাশের উপক্রম হইল—তদ্ধেতু রামাবতার রাজধর্ম্মশিক্ষাদানার্থ অবতীর্ণ হইলেন। পিতৃ-

ভক্তি, রাজধর্ম্ম, পুত্রস্নেহ, প্রজাপালন, এসকলের পরাকাষ্ঠা, তাঁহার চরিত্রে দেখিতে পাই। স্বয়ং বিষ্ণু অংশচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন, এই চারিনামে আখ্যাত হইলেন। যৎকালে কৈকেয়ীর বর প্রার্থনায় রাজা দশরথ নিতান্ত কাতর হইলেন; রামের বনগমন ও ভরতের রাজ-সিংহাসনগ্রহণ উভয়ই তাঁহার নিকট ঘোর দুর্দ্দৈব বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এক দিকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত পাপরাশি, অন্য দিকে পুত্র-নির্ব্বাসনজনিত হৃদয়ের ঘোর অবস্থা—উভয়ই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দশরথকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। দশরথ বিষম বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন রোষভরে কহিতেছেন ;—

নাহমিচ্ছামি নির্ঘৃণাং নৃশংস্যাংকৈকেয়ীং—

আবার কখন কাতর কণ্ঠে কহিতেছেন ;—

প্রসীদ দেবী রামোমে ত্বদ্দত্তং রাজ্যমব্যয়ম্।
লভতামসি তাপাঙ্গি যশঃ পরমাব্যসি ॥

রাম তখন দেখিলেন, প্রমাদ! পিতার তদানিন্তন হৃদয়ের অবস্থা নিজের হৃদয়ে স্থাপন করিয়া দেখিলেন, পিতার কি বিষম যন্ত্রনা! তখন তিনি পিতার চরণ ধারণ করিয়া কহিলেন "পুত্র অপেক্ষা প্রতিজ্ঞা শ্রেষ্ঠ। পুত্র নষ্ট হইলে পুনরায় পুত্রোৎপাদন আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইলে অশীতিলক্ষ জন্মেও তাহার সংশোধন, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, অতএব পিতঃ! আমাকে বনবাসে দিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন,

বিশেষ পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালনই পুত্রের সনাতনধর্ম্ম. আমি সেই ধর্ম্ম পালন করিতে সমুৎসুক, যাহাতে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন হয় এবং আমারও বাসনা পূর্ণ হয়, এইরূপ বিধান করুন।” দশরথ রামবাক্য শ্রবণে আরও শোকাকুল হইলেন। এমন পুত্র, যাহার গুণে সমস্ত কোশল রাজ্য মুগ্ধ, তাহাকে কোন্ প্রাণে বনবাস দিবেন? কিন্তু কৈকেয়ীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে, রাম বনগমনে ঐকান্তিকী একাগ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দশরথ তথাপি সম্মত হইলেন না, কিন্তু রাম বারম্বার প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত দুরপনেয় ভীষণ পাপের চিত্র তাঁহার সম্মুখে ধরিতেছেন, দশরথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মৌনীভাব অবলম্বন করিলেন, রাম তাহাই পিতার সম্মতিজ্ঞাপক চিহ্ন বিবেচনা করিয়া স্বীয় জীবিতরূপিণী সীতাদেবী এবং দক্ষিণহস্তস্বরূপভ্রাতা লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনবাসে গমন করিলেন। বিশেষ তিনি কৈকেয়ীকে কহিলেন :—

অহং হি বচনাদ্রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে।
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপিচার্ণবে॥
তদ্‌ব্রূহি সত্বরং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামোর্দ্বিনাভি·ভাষতে॥

কৈকেয়ী তদুত্তরে কহিলেন ;—

ত্বয়ারণ্যং প্রবেষ্টব্যং নববর্ষাণি পঞ্চ চ।
ভরতশ্চাভিষিচেত্য যদেতদভিষেচনম্॥

তাহাব সমস্ত থাকিলেও এই একটী মাত্র কারণে তাঁহাকে আমরা পূর্ণব্রহ্ম বলিতে সক্ষম নহি। অনেকে সীতাকে বনবাস-প্রেরণ নিবন্ধন রামের পবিত্রচরিত্রে কলঙ্ক দান করেন, কিন্তু সে বিষয় আমরা অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নহি, বরং তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিতেই প্রস্তুত আছি। রাম রাজবতার, রাজকার্য্য ও প্রজাবঞ্জনাদি শিক্ষা দান কবণার্থই হবিব অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজারঞ্জনার্থ আপন জায়াকে বনবাসে প্রেরণ, সেই রাজধর্ম্মের একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। রাম স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী সীতাকে বনবাসে প্রেরণ দ্বারা জগতের রাজন্য-সম্প্রদায় মধ্যে প্রজার সুখবর্দ্ধন হেতু প্রাণাধিকা—অর্দ্ধাঙ্গ জায়া বিসর্জ্জনও যে অনুষ্ঠেয়, এই কথার সুন্দর উদাহরণ স্থাপন করত নিজের মহত্ব ও প্রজারঞ্জনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। এক দিকে প্রজারঞ্জন, অপর দিকে আপন হৃদয়াধিকা প্রিয়তমা জায়া বিসর্জন, এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী অধিকতর মূল্যবান এবং অনুষ্ঠেয়? আমারা রাজা নহি, রাজধর্ম্মও জানিনা, তবে হৃদয়াধিকা প্রিয়তমা জায়ার অধিকারী বটে, সেই জনাই মীমাংসা করি যে, রামের অর্দ্ধাঙ্গিনী—যাঁহার সুখ দুঃখ, জীবন মরণ সকলই তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে, তিনি সর্ব্বতোভাবে যাঁহার রক্ষার কর্ত্তা, সেই পতিপরায়ণা সীতাকে সহায়শূন্য বিজনঅরণ্যে বনবাস দিয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই। যাঁহাকে রক্ষা করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য, তাঁহাকে ঘোরবিপদসঙ্কুল কাননপ্রদেশে নিক্ষেপ করা—নিতান্ত নির্দ্দয় ও অধার্ম্মিকের কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু রাম আমাদিগের ন্যায় মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহাব প্রকৃতিও আমাদিগের ন্যায়

ছিলনা, তিনি রাজবতার; রাজকার্য্য শিক্ষা দানার্থই তাঁহার আগমন; তিনি সেই প্রজারঞ্জনার্থই স্বীয় জায়া বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তিনিই আপনার দেহ দিয়াও প্রজাপালন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রজার হিতার্থ,—প্রজার মঙ্গল-বিধানার্থ তিনি আপন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সীতাকে বনবাস দিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাই আমরা সীতা-বনবাসজনিত কলঙ্ক, রাম চরিত্রে প্রক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহি।

রামের চরিত্রে আর একটী কলঙ্ককাহিনী মেঘনাদবধ। মেঘনাদবধ, রাজধর্ম্মের এবং ন্যায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। রজনীযোগে গুপ্তদ্বার দিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক যজ্ঞাগারে ইষ্ট-চিন্তায় নিমগ্ন নীরস্ত্র মেঘনাদের গুপ্ত হত্যা, বর্ত্তমান কৌশলী রাজপুরুষগণের করণীয় হইলেও, যিনি পূর্ণব্রহ্ম, ভূভার হরণার্থ যিনি অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি ধর্ম্ম রক্ষার্থ সমাগত, সেই রামাবতারের কথনই অনুষ্ঠেয় ও অনুমোদিত হইতে পারে না। নীরস্ত্র মেঘনাদ সম্মুখে আপন কৃতান্তকে দর্শন করিয়াও তাঁহাকে অতিথী জ্ঞানে পূজা করিতে চাহিল, শ্রান্তি দূর করিয়া নির্দ্দিষ্ট রণক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে সমরসাধ পূর্ণ করিবে কহিল, নিজে নীরস্ত্র—বীর পুরুষের নীরস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধ সম্ভবে না বলিল, তথাপি লক্ষ্মণ সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, কহিলেন "তুই রাক্ষস, রাক্ষস বধে রাজধর্ম্ম কি জন্য প্রতিপালন করিব।" পাঠকগণ, নিবিষ্ট চিত্তে একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, লক্ষ্মণের কথা কতদূর সঙ্গত। যাহার প্রতিযোগীতায় দেবতা সকলে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছেন,

যাঁহাদিগের নিধনসাধনোদ্দেশে তাঁহাকে অবতারত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে, ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ যাহার নিকট ভৃত্যবৎ-কালযাপন করেন, তাহাকে যে তুচ্ছ রাক্ষস বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য, এ কথা কোন মতেই বিশ্বাস যোগ্য নহে। মেঘনাদবধবিবরণ সম্যক্‌ আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সম্মুখসমরে আপনাকে অসমর্থ জানিয়াই রাম এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন। পরন্তু এতাদৃশ কৌশলাবলম্বনে মেঘনাদকে নিহত করা—রাম চরিত্রের ঘোর কলঙ্ক! রামচরিত্রে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলঙ্ককাহিনী জনসমাজে প্রচারিত থাকিলেও তাহা ঈদৃশ অপরিস্ফুট ও অকিঞ্চিৎকর যে বৃথাবাহুল্যভয়ে আমরা তদুল্লেখে নিবৃত্ত হইয়া সংক্ষেপে রামাবতারের স্ফুটচিত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"এই মহাবীর রাম, অসূয়াশূন্য ও প্রিয়দর্শন। ভূতলে তাঁহার তুলনা নাই। তিনি পিতার ন্যায় গুণবান এবং প্রশান্তস্বভাব। তিনি মৃদুবচনে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি ঐরূপ কথা কথনই ওষ্ঠের বাহির করেন না। অন্যকৃত একটি মাত্র উপকারেও তাঁহার পরিতোষ জন্মে, এবং অপকার অনন্ত হইলেও স্বীয় উদার গুণে সমগ্র বিস্মৃত হন। তিনি অস্ত্রাভ্যাসের অবকাশ কালেও সুশীল বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী সাধুগণে পরিবৃত হইয়া শাস্ত্ররহস্য অনুশীলন করিয়া থাকেন। তিনি বুদ্ধিমান ও প্রিয়ম্বদ। কেহ অভ্যাগত হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া থাকেন। তিনি অতি বলবান, কিন্তু আপনার বীর্য্যমদে কখনই উন্মত্ত হন না। তিনি সত্যবাদী, বিদ্বান ও বন্ধুবর্গের মর্য্যাদা

পালক। তিনি প্রজারঞ্জক, প্রজারাও তাঁহার প্রতি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি বিপ্রভক্তিপরায়ণ ও দীনশরণ। তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র। তিনি দুষ্টের নিয়ন্তা, ধর্ম্মজ্ঞ ও দেশকালদর্শী। তাঁহার বুদ্ধি স্বীয়বংশেরই অনুরূপ, এই কারণে তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে বহুমান করিয়া থাকেন এবং ঐ ধর্ম্ম রক্ষা করিলে যে স্বর্গ লাভ হয়, ইহা তাঁহার স্থিরবিশ্বাস। অমঙ্গল প্রসঙ্গেও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কথায় তাঁহার অভিরুচি নাই। কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তাহাতে উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদশন করিতে পারেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় সুলক্ষণ সম্পন্ন। তিনি তরুণ ও নীরোগ এবং পুরুষপরীক্ষায় সুদক্ষ, জগতে তিনিই একমাত্র সাধু। সেই রাজকুমার প্রকৃতিবর্গের বহিশ্চর প্রাণের ন্যায় একান্ত প্রিয়। তিনি বেদ বেদাঙ্গে অধিকার লাভ করিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিয়াছেন, সমন্ত্র ও অমন্ত্রক অস্ত্রশস্ত্রে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কল্যাণের জন্মভূমি, তেজস্বী ও সবল। সঙ্কটস্থলেও তিনি কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না। ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আচার্য্য। তিনি ত্রিবর্গতত্ত্বজ্ঞ, স্মৃতিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন। তিনি লৌকিকার্থকুশল, বিনীত, গম্ভীর গূঢ়মন্ত্র ও সহায়শীল। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখনই নিষ্ফল হয় না। অর্থ যে ন্যায়ানুসারেই উপার্জ্জন ও সৎপাত্রেই দান করিতে হয়, তিনি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার ভক্তি অতি অসাধারণ। তিনি অসৎ বস্তু গ্রহণে কখনই লোলুপ নহেন। তিনি আলস্যশূন্য, সাবধান ও স্বদোষদর্শী। তিনি কৃতজ্ঞ ও লোকের অন্তরজ্ঞ। তিনি ন্যায়ানুসারে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন

করিয়া থাকেন। কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছে এবং তিনি ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে সুখ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কর্ত্তব্যভারবহনে তাঁহার আলস্য নাই। যে সমস্ত শিল্প বিহারকালে বিশেষ উপযোগী, তিনি তৎসমুদায় আয়ত্ত করিযাছেন। তিনি অর্থ বিভাজনে সুপটু। হস্তী ও অশ্বে আরোহণ ও উহাদিগকে শিক্ষা দান, এই উভয় কর্ম্মেই তিনি সুদক্ষ। বিপক্ষ সৈন্যের অভিমুখে গমন, শত্রু সংহার ও ব্যূহ রচনা, সমস্ত কর্ম্মে তিনি সুপারগ। তিনি ধনুর্ব্বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও অতিরথ। দেবাসুরগণ রোষাবিষ্ট হইলেও তাঁহাকে সংগ্রামে পরাভব করিতে পারেন না। তিনি কোনও অংশে লোকের অবজ্ঞাভাজন নহেন। তিনি কালের অনায়ত্ত এবং ত্রিলোকপূজিত; তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর ন্যায় এবং বলবীর্য্যে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায অভিহিত হইয়া থাকেন। রাম, পিতার প্রীতিকর প্রকৃতিবর্গের বাঞ্ছনীয় এইরূপ গুণগ্রামে করজালমণ্ডিত প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন দেবী বসুমতী এই সচ্চরিত্র অধৃষ্য-পরাক্রম লোকনাথসদৃশ রামকে অধিনাথরূপে প্রার্থনা করিলেন।”—হেমচন্দ্র।

অতঃপর বুদ্ধাবতারের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া তদ্‌গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

বুদ্ধ চরিত্রে অনেকে যে সমস্ত দোষারোপ করেন, বস্তুত তাহা কলঙ্ক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অনেকে বলেন, যুবতী ভার্য্যা, বৃদ্ধ জনক জননী পরিত্যাগ করা রক্তমাংস গঠিত হৃদয়বান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবেনা, কিন্তু আমরা বলি, যাহার

প্রাণমন হরিপ্রেমে মুগ্ধ, হরিপ্রেমে উন্মত্ত, যাহার হৃদয় হরিময়, যাহার দৃষ্টিতে বিশ্ব হরিময়, হরিসর্ব্বস্বনেত্রে অন্তরে বাহিরে উর্দ্ধে অধোতে যে, সর্ব্বত্র সেই সর্ব্বময় হরিকে দেখিতে পায়, তুচ্ছ সাংসারিক বন্ধনে, অনিত্য স্নেহ মমতার বন্ধনে, মায়া জড়িত থাকা, তাহার পক্ষে অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। অনিত্য পত্নিপ্রেম, অনিত্য পিতৃমাতৃস্নেহ, অনিত্য মায়ামোহ, তৃণ তাচ্ছলে ত্যাজ্য ভাবিয়া, উদাসহৃদয়ে সেই হরিগত প্রাণ, হরির প্রেমসিন্ধু মন্থন করিয়া প্রতিনিয়ত হরির করুণামৃত পানেই আত্মবিভোর হইয়া থাকেন, অন্তরে গুহ্যভাবে সেই প্রেম-মূর্ত্তির গুহ্যসাধনে ব্যাপৃত রহিয়া, বাহ্যে জাগতিক সমস্ত বিষয়-ব্যাপারেই তিনি জ্ঞানান্ধবিবেকীবৎ নির্লিপ্ত বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন, সুতরাং, পিতা মাতা প্রভৃতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকিবে কিরূপে? হরিই তাঁহার সর্ব্বস্বধন, সুতরাং সাধা-রণে যে দোষ বুদ্ধের প্রতি অর্পণ করেন, তাহা প্রকৃত ভক্তির লক্ষণ বলিয়াই অনুভূত হয়। তবে একটী মাত্র কারণে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অপকারিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। তিনি যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, সেধর্ম্ম——বৈরাগ্য! কিন্তু সংসারে, বৈরাগ্য ধর্ম্ম——যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে প্রাণ সংসারের, প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়——কদাচ হরির অভিপ্রেত হইতে পারে না। কেন না, ধর্ম্ম সংস্থাপন ও সৃষ্টিসংরক্ষণ উভয়ই তাঁহার একরূপ অভিপ্রেত। জগতে এমন কোন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে, ধর্ম্মফলের সহিত সংসারও উন্নত হয়। যে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সংসারে প্রতি অশ্রদ্ধা না জন্মে, অথচ ধর্ম্মের ফলশ্রুতিও প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ধর্ম্ম

প্রবর্ত্তিত হওয়াই হরির একমাত্র অভিপ্রেত; সুতরাং প্রবুদ্ধ বুদ্ধের এই রক্ষমাণ ধর্ম্ম, প্রকৃত ধর্ম্মলক্ষণসংযুক্ত হইলেও সংসার বাসীর পক্ষে ইহা উপযুক্ত নহে। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রহণ ও এতদ্‌-ব্রতের নিয়মিত সাধন করিতে হইলে অগ্রেই ত্যাগস্বীকারের সাধন করিতে হয়, সংসারীকে সর্ব্বাগ্রেই সংসারত্যাগী হইতে হয়। যদি বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সংসারের হিত সাধন না হইয়া প্রত্যুত অহিতই সংঘটিত হয়, তাহা হইলে সে ধর্ম্ম কিরূপে শ্রীহরির অভিপ্রেত হইতে পারে? অপিচ তাঁহার যাহা অনভিপ্রেত, তাহা তাঁহারদ্বারা কিরূপেই বা সংসাধিত হইতে পারে?

অতঃপর কল্কির কার্য্যকলাপ আলোচিত হইতেছে। কল্কি কলি কালের অবতার। তাঁহার কার্য্যকলাপ এখনও ভবিষ্যতের ঘনতমসাচ্ছন্ন নিবীড় গুহায় নিদ্রিত রহিয়াছে। কোন্‌ কালে তিনি আবির্ভূত হইবেন, কোন্‌ কালে তিনি কি কি কার্য্য করিবেন,– তাহারও কোনও স্থিরতা নাই সুতরাং সে কথা এখন বর্ণন করা অসম্ভব।

---

* কল্কি পুরাণ পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কল্কির লীলা সমাধা হইয়াগিয়াছে। কল্কি পুরাণে সকলই হইয়াছেন বলিয়া লিখিত আছে। হইবে বলিয়া কোনও উক্তির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হয় না, এ সকল কথার সামঞ্জস্য কি?

কল্কি পুরাণে আরও উল্লেখ দৃষ্ট হয় যে, কল্কি, পরশুরামের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরশুরামের আবির্ভাব কালান্তে আরও তিনটী অবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই অবতারত্রয়ের লীলা সমাধা হইলে কল্কি আবির্ভূত হন, কিন্তু

অন্যান্য অবতারগণের লীলা কিয়ৎ পরিমাণে বর্ণিত হইল, এক্ষণে কৃষ্ণাবতারের বিষয় যথা সাধ্য বর্ণিত হইতেছে। আমরা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে, কেবল একমাত্র কৃষ্ণই পরাৎপর পূর্ণব্রহ্ম। যে যে কারণের বর্ত্তমানতা পরিলক্ষিত হইলে তাঁহাকে পূর্ণ পরাৎপর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, কৃষ্ণে তৎসমস্তই বর্ত্তমান।

যিনি চৈতন্যময় এবং বিশ্বের বীজ স্বরূপ, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ নিরন্তর যাঁহার প্রার্থনা করেন, যিনি অদ্বিতীয় এবং অপার মহিম, যিনি অনন্ত, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই ত্রিগুণাত্মক; যিনি চরাচরের স্রষ্টা, পাতা এবং সংহারকর্ত্তা, সেই শ্রীহরির বিবরণ কীর্ত্তন করা যাউক, যাঁহার মন্ত্রণায় ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ঘোর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, যিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ কুরুপাণ্ডবসমরসাগরের কর্ণধাররূপে বিরাজিত থাকিয়া ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় সাধন করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের জলন্ত আদর্শদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যিনি পবিত্র এবং কলঙ্কশূন্য; তাঁহার পবিত্রচরিত্র- যথাসাধ্য বর্ণন করিতে অগ্রসর হইতেছি। যিনি অজর, অমর এবং বিধাতা, যিনি নির্ব্বিকার এবং নিরাকার হইয়াও জগতে ধর্ম্মস্থাপন,

---

পরশুরাম যে কল্কির আবির্ভাব কাল পর্য্যন্তও জীবিত ছিলেন, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এ সকল তত্ত্ব সম্যক ধারনা বা সামঞ্জস্য করা নিতান্তই কঠিন ব্যাপার।

পরশুরাম কহিতেছেন;—

মত্তোবিদ্যাং শিবাদস্ত্রং লব্ধা বেদময়ং শুকম্।
সিংহলে চ প্রিয়াং পদ্মাং ধর্ম্মান্ সংস্থাপয়িস্যামি॥

ধার্ম্মিকগণের রক্ষাসাধন এবং অধার্ম্মিকগণের নিধন জন্য সাক্ষাৎ-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং করিবেন, যাঁহার মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য অনন্ত কৌশলে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইতেছে, যাঁহার পূত চরিত্র সাধুগণের সর্ব্বদা প্রার্থনীয়, সেই বিঘ্নবিনাশকারী শ্রীহরির চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার চরিত্রকীর্ত্তনে অগ্রসর হইলাম। কৃতকার্য্যতা ফলাফল মঙ্গলময়ের প্রতি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

কৃষ্ণবিষয়ক যতগুলি গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, মহাভারত তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; এবং ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যাহা মহাভারত রচনার পরে রচিত হইয়াছে, তাহাও মহাভারত হইতে গৃহিত এবং কল্পনায় অতিরঞ্জিত। আমরা বলি একমাত্র মহাভারত অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণ চরিত্র লিখিত হওয়া বিধেয়; কেন না মহাভারতের পরে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা মহাভারত হইতে গৃহিত হইলেও এতাদৃশ কল্পনা জড়িত যে, তন্মধ্য হইতে সত্য নিষ্কাসন করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। এই সমস্ত অসুবিধা নিবারণের একমাত্র উপায় মহাভারতের আশ্রয় গ্রহণ। যাহা মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই সত্য এবং যাহা মহাভারতে নাই তাহা অসত্য অথবা কল্পনামণ্ডিত। মহাভারত ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থের অসারতা প্রতিপাদন আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। সত্যের অস্তিত্ব তাহাতেও বর্ত্তমান থাকা সম্ভবিতে পারে কিন্তু যদি একমাত্র মহাভারতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণচরিত্র সম্যক চিত্রিত হয়, তাহা হইলে অপরাপর গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি? অনেকে বলেন, মহাভারত বেদব্যাস প্রণীত বটে, কিন্তু মহাভারত হইতে প্রাচীনতর গ্রন্থেও

শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণিত আছে, সুতরাং, যে যুক্তি অবলম্বনে অন্যান্য গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মহাভারত অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্ণচরিত্র সমালোচিত হইতে পারে, সেই যুক্তি বলে মহাভারতও পরিহার করিয়া তৎপূর্ব্বরচিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াও ত শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বিবৃত হইতে পারে। এথানে দেখা যাউক, মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ কি? প্রতিপক্ষগণ বলেন——রামায়ণ। মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ রামায়ণেও পাণ্ডব ও কৃষ্ণ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতকার, রামায়ণ হইতে সেই সামান্য ঘটনা মাত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাতে স্বকপোলকল্পিত ঘটনাবলীর সংযোজনে অতিরঞ্জিত করিয়া মহাভারত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

আর এক সম্প্রদায়ের উক্তি;—পাণ্ডব বা কৃষ্ণ নামধেয় কোনও অবতার অবনীতে অবতীর্ণ হননাই। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধও অলীক কল্পনামাত্র প্রভৃত। পাঠকগণ অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকিবেন যে, একথা কত দূর যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত। তবে একটী মাত্র বিষয়ে পাঠকগণের মনে সন্দেহ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। ত্রেতাযুগে রামাবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বাল্মীকি আবার রামাবতার আবির্ভূত হইবার ষষ্টিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আর কৃষ্ণ দ্বাপরযুগের অন্তকালে অবতারত্ব গ্রহণ করেন, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধও দ্বাপরযুগে সংঘটিত হয়, মহাভারতও তৎকালরচিত। সুতরাং, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ যে রামায়ণের এক যুগেরও অধিককাল পরে মহাভারত রচিত হইয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে প্রতিপক্ষগণ যে যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক রামায়ণ অবলম্বনে কৃষ্ণ

চরিত্র বর্ণন করিতে অনুমোদন করিতেছেন, তাহা আশ্চর্য্য বা বিস্ময় জনক নহে। কিন্তু এই ঘটনাপুঞ্জের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে রহস্যময় সত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইব যে, রামায়ণ, মহাভারতের অনেক পরে রচিত হইয়াছে। রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতই প্রাচীন গ্রন্থ। ভরসা করি, ইহা সপ্রমাণ করিতে পারিলে প্রতিপক্ষগণের কোন যুক্তিই কার্য্যকরী হইবে না। এক্ষণে দেখা যাউক ইহা প্রতিপন্ন হয় কি না; দেখাযাউক মহাভারত রামায়ণ হইতে প্রাচীন কি না।

মহাভারত যে, রামায়ণের অনেক পূর্ব্বে রচিত, তাহা এক একটী উদাহরণ দ্বারা প্রমান করিব। প্রথমতঃ এই,—পাণ্ডুরাজ নিঃসন্তান। তিনি কুন্তিকে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিতে উপদেশ দিলেন। কুন্তি স্বামীর আজ্ঞা অতিক্রম করিতে পারিলেন না, অগত্যা তদাদেশ প্রতিপালন করিলেন। রামায়ণে দেখ;—দশরথ নিঃসন্তান, কিন্তু তিনি ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে মহিষীগণকে উপদেশ দিলেন না, অশেষ প্রকার দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সন্তান উৎপাদনার্থ কৃতকল্প হইলেন। এই স মাজিক ঘটনাদ্বয়ের কোন্‌টী প্রাচীন ?

পূর্ব্বকালে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তাদৃশ কোন বন্ধন ছিলনা। স্ত্রী স্বামিকে অতিক্রম করিয়া অন্য পুরুষে উপরত হইলে তাহার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিত না। পরিশেষে মহামনা দীর্ঘতমা (২)

---

(২) অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।

ও মহাত্মা শ্বেতকেতু স্ত্রী পুরুষের মধ্যে দাম্পত্যবন্ধন প্রবর্ত্তন করিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন প্রথা, দৈবকার্য্যদ্বারা পুত্র উৎপাদন প্রথা হইতে প্রাচীন ; সুতরাং. ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন বিধি মহাভারতে যথা-বিধি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মহাভারত রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ।

দ্বিতীয়তঃ—রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে "তৈত্তিরীয় শাখাবিদ্ আচার্য্যগণ কৌশল্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।" (৩) এক্ষণে দেখা যাউক তৈত্তিরীয় শাখাবিদ্-আচার্য্য কাহাকে বলে। সপ্তবিংশতি শাখায় যজুর্ব্বেদ বিভাগ কর্ত্তা, বেদব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের যাজ্ঞবল্ক্য নামক একজন শিষ্য ছিলেন। বৈশম্পায়ন ব্রহ্মশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, শিষ্যগণকে ব্রতানুষ্ঠান করিতে আদেশ প্রদান করিলে যাজ্ঞবল্ক্য গর্ব্বিত বচনে কহিলেন (৪) "আমি একাকীই—এই দুশ্চর ব্রতের অনুষ্ঠান করিব। আপনার

এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণং।

মহাভারতম্।

(৩) কৌশল্যাং চ য আশীর্ভির্ভক্তঃ পর্য্যুপতিষ্ঠতি।
আচার্য্যস্তৈত্তিরীয়াণামভিরূপশ্চ বেদবিদ্॥

ভাগবত পুরাণম্।

(৪) যাজ্ঞবল্ক্যস্তু তচ্ছিষ্য আহাহো ভগবান্ কিয়ৎ।
চরিতেনাল্পসারাণাং চরিষ্যেঽহং সুদুশ্চরং॥ ৫৪॥

অন্যান্য শিষ্যগণ অধিকতর তেজস্বী নহেন।" ইহা শুনিয়া বৈশম্পায়ন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "তুমি ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছ, অতএব আমার নিকট তুমি যে সমস্ত বিদ্যা লাভ করিয়াছ, অবিলম্বে তাহা প্রত্যর্পণ কর।" যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর আদেশক্রমে রক্তাক্ত যজুর্ব্বেদ উদ্গীরণ করিলে, অন্যান্য শিষ্যগণ তিত্তিরি পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া তাহা সংগ্রহ করিলেন। এই হইতে যজুর্ব্বেদের সেই শাখা তৈত্তিরীয় নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে. এক্ষণে দেখুন বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন, বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য এই যাজ্ঞবল্ক্য হইতেই তৈত্তিরীয় শাখার সৃষ্টি হইয়াছে। সেই শাখার উল্লেখ রামায়ণ মধ্যে বর্ত্তমান। পাঠক বিবেচনা করুন—রামায়ণ ও মহাভারত, এতদুভয়ের মধ্যে কোনখানি প্রাচীন।

ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো যাহ্যলং ত্বয়া।
বিপ্রাব মন্ত্রাশিষ্যেণ মদধীতং ত্যজাশ্বিতি ॥ ৫৫ ॥
দেবরাতসুতঃ সোঽপি ছর্দ্দিত্বা যজুষাং গণং।
ততো গতোঽথ মুনয়োদ দৃশুস্তান্ যজুর্গণান্ ॥ ৫৬ ॥
যজুংসি তিত্তিরা ভূত্বা তল্লোলুপতয়া দত্তঃ।
তৈত্তিরিয়া ইতি যসুঃ শাখা আসন সুপেশলাঃ ॥ ৫৭ ॥

ভাগবত পুরাণম্ ১২-৬অ

যজুর্ব্বেদতরোঃ শাখা সপ্তবিংশন্মহামতিঃ।
বৈশম্পায়ন নামাসৌ ব্যাসশিষ্যশ্চকারবৈ ॥ ১ ॥
তস্যাবৈ সপ্তরাত্রাত্ত্ব ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি। ৩ ॥
বৈশম্পায়ন একস্তু তং ব্যাতিক্রান্তবাং স্তদা ॥ ৪ ॥
স্বস্রীয়ং বালকং সোঽথ পদাস্পৃষ্ট মতাড়য়ৎ ॥ ৫ ॥

কথাটা আরও একটু বিশদ করা যাউক। ভাগবত পুরাণের প্রথম স্কন্ধে লিখিত আছে "সপ্তদশ অবতার, পরাশর ঔরসে সত্যবতী গর্ভে ব্যাস নামে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তিঁনি মনুষ্য-দিগকে স্বল্পজ্ঞানী দর্শনে, বেদকে নানা শাখায় বিভক্ত করি-লেন। অতঃপর অষ্টাদশাবতারে দেবকার্য্য সাধনার্থ, নরদেব রাঘব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সিন্ধুবন্ধনাদি মহাকার্য্য সাধন করিয়া-ছিলেন। (১) পাঠক! এখনও কি আর প্রমান করিতে হইবে? এখনও কি বুঝিতে বাকী আছে, যে মহাভারত, রামায়ণের বহু পূর্ব্বে রচিত?

মহাভারতের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদিত হইল, এক্ষণে কৃষ্ণ-চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

মহাভারতে কৃষ্ণের বাল্যজীবন কিছুই নাই; তাঁহার নবনীত অপহরণ, গোবর্দ্ধন ধারণ, ব্রজাঙ্গনা গোপকন্যার সহিত গুপ্তপ্রেম, গোপিনীগণের সহিত নিভৃতকাননে কেলী, মহাভারতে এ

অথাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং কিমেভির্ভগবন্ দ্বিজৈঃ।
কেশিতৈরল্পতেজোভিশ্চরিষ্যেঽহমিদং ব্রতম্ ॥ ৭ ॥
ততঃ ক্রুদ্ধো গুরুঃ প্রাহ যাজ্ঞবল্কং মহামতিঃ।
মুচ্যতাং যৎ ত্বয়াধীতং মত্তো বিপ্রাবমানক ॥
ইত্যুক্তা রুধিরাক্তানি সরূপানি যজুংষি সঃ।
ছর্দ্দয়িত্বাং দদৌ তস্মৈ যযৌ চ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ ॥ ১১ ॥
যজুংষ্যথ বিসৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজাঃ।
জগৃহুস্তিত্তিরা ভূত্বা তৈত্তিরীয়াস্তু তে ততঃ ॥ ১২ ॥

(১) ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥
নরদেবত্বমাপন্নঃ সুর কার্য্যচিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃ পরং ॥ ২১ ২২ ॥

সকলের কিছুই নাই। একবারেই তিনি দ্রৌপদীর সয়ম্বর সভায় সাধারণ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের সহিতও তাঁহার আলাপপরিচয়ের কিছুই নাই। এই তাঁহার প্রথমপরিচয়। তবে ইহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তিনি তৎকালে সাধারণ্যে অপরিচিত ছিলেন না। ব্যাসদেবও বোধ হয় সেই জন্যই তাঁহার বিস্তৃতজীবনচরিত বিবৃত করেন নাই। যাঁহাকে সকলেই চিনে তাঁহার অসার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

তাহার পর শিশুপালবধ। ভীষ্মকে কৃষ্ণপূজায় রত দেখিয়া, শিশুপাল, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে সমস্ত ভীষণ গালি বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও গোপীকাহরণাদির কিছুই উল্লেখ নাই। কৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার যদি কোন প্রকারে মহাভারতকারের অন্তরে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে সে সকল কথা শিশুপালের গালির মধ্যে নিশ্চয়ই স্থান প্রাপ্ত হইত, কিন্তু তাহাও হয় নাই। সুতরাং, আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ইহাই স্বীকার করিতে হইতেছে যে, কৃষ্ণচরিত্র সম্পূর্ণ কলঙ্ক শূন্য, গোপীবিহাররূপ দোষাবহ ব্যবহার অলীক কল্পনা মাত্র। শিশুপাল ভীষ্মকে কহিলেন, "তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া সেই বালকেরও ঘৃণ্য গোপালের কিজন্য প্রশংসা করিতেছ? সে (কৃষ্ণ) বাল্যকালে শকুনি অশ্ব ও বৃষভ নষ্ট করিয়াছিল, অথবা বল্মীক-পিণ্ডবৎ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিল—ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় ত কিছুই দেখিতে পাইনা? সেই দুরাচার কৃষ্ণ কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহারই জীবন বিনাশ করিয়াছে।"

শিশুপালের উক্তিতে গোপীকাহরণাদির কিছুই উল্লেখ নাই

সেই জন্যই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মহাভারত ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই ভ্রম প্রমাদ ও অতিরিক্ত স্বকপোল-কল্পনায় পূর্ণ।

আর এক কথা—শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে কখনও হরির অবতার বলিয়া বা ভাবিয়া, কোনও কথা কহেন নাই। যদিও স্থান-বিশেষে পাকেপ্রকারে একটুকু আধটুকু উল্লেখ থাকে, তাহা কেবল অতিরঞ্জিত কল্পনামাত্র। কৃষ্ণের মহত্ত্ব, গুণাগুণ ও দেবত্ব-সম্বন্ধে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল বটে, সর্ব্বপ্রথমে ভীষ্ম, কৃষ্ণকে দেবতা—এমনকি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন। শিশুপাল তাহারই প্রতিবাদ করিতে গিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন। তৎপরে পঞ্চপাণ্ডব ও তৎপক্ষীয়গণ কৃষ্ণের দেবত্ব ঘোষণা করিলে, দুর্য্যোধন এবং কর্ণাদি তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, প্রত্যুত আজীবন তাঁহারা কৃষ্ণের নিন্দাতেই কালাতিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ মনুষ্যসাধ্য-কার্য্য ভিন্ন কখনও অমানুষিক দৈবশক্তির দ্বারা কোন কার্য্যই সংসাধন করেন নাই। তাহার প্রধান কার্য্য——ধর্ম্ম প্রচার, তিনি সেই ধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু হাত মুখ নাড়িয়া, বক্তৃতা দিয়া ধর্ম্মপ্রচারকরেন নাই, আপনকার্য্য দ্বারা ধর্ম্মের অলৌকিক জ্যোতি ও শক্তি প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের নেতা ছিলেন বটে, তাঁহারই পরামর্শক্রমে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে কখনও অস্ত্র ধারণ করিয়া কাহাকেও নিধন করেন নাই। ঐশ্বরিক প্রত্যেক কার্য্যে এক একটী নিমিত্তের ভাগী উপলক্ষ্যকারণ থাকে, আদৌ

তিনি সকল সাধন করিতেছেন, জীব রোগে বা অন্য যে কোন কারণে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, মোক্ষ কারণ তিনি। তদ্রূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া ইনি পাণ্ডবগণের উপলক্ষে স্বকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং অস্ত্র ধারণ না করিয়া পাণ্ডবদিগের উপলক্ষে অবাধ্য অধার্ম্মিক কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল এবং বাধ্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজের জয় ঘোষণা করিয়া আপন কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। তাইবলি, তিনি যে কারণে অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সাধন করিবার জন্য কোনও অলৌকিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। কোনওনা কোনও নিমিত্ত কারণ দ্বারা কৌশলে স্বকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। যে সমস্ত উপায়ে তিনি স্বকার্য্যসাধন করিয়াছিলেন, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। সে সকল কার্য্য সাধন করা ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব।

অনেকের বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। কৃষ্ণ স্বয়ং কখনও অস্ত্র ধারণ করেন নাই এবং কখনও কাহার নিধন সাধনও করেন নাই। শিশুপালবধ সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেক প্রকার কু ধারণা আছে, বস্তুত তিনি শিশুপালের সহিত যুদ্ধ করেন নাই—দণ্ডিত করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে, তুচ্ছ অস্ত্র ধারণ করেন নাই; অতুচ্চ কৌশলই তাঁহার অদ্বিতীয় অস্ত্র। সেই অস্ত্রে তিনি সকল কার্য্যই সাধন করিয়াছিলেন। কৌশলাবলম্বন দ্বারা তিনি সাধুগণের পরিত্রাণ, অধার্ম্মিকগণের নিধন ও ধর্ম্মরক্ষা সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক কৌশল অস্ত্রাপেক্ষা অধিকতর সুফল প্রসব করিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া বর্ণন করিতেগিয়া মহাভারতকার তাঁহাকে এক স্থানে "রাধারমণ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু যে স্থলে তাঁহাকে উক্ত সম্বোধনে আহুত করা হইয়াছিল সেই স্থানটুকু একটুকু অভিনিবেশসহকারে পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, তিনি রাধানাম্নী কোনও গোপরমণীকে রমণ করেন নাই। কৃষ্ণ রাধার প্রেমে আসক্ত ছিলেন, মহাভারতকার এ উদ্দেশ্যে তাঁহাকে "রাধারমণ" বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। এ সম্বোধনের বড়ই উচ্চভাব আছে। রাধা——জগত, যিনি সেই জগতে নিয়ত রত, অর্থাৎ যিনি সংসারহিতে আসক্ত, তিনই রাধারমণ। (৬) যিনি সংসারের হিতব্রতে নিরন্তর রত রহিয়াছেন, যিনি সংসার প্রেমে নিবদ্ধ হইয়াও মুক্ত, তিনিই রাধারমণ। রাধারমণ বড় উচ্চ-ভাবব্যঞ্জক। বড়ই মহান।

কৃষ্ণের আর একটী কলঙ্কের কথা প্রতিপক্ষগণের দ্বারা উত্থাপিত হইতে পারে। "অর্জ্জুন জ্ঞাতিবধে নিস্পৃহ হইলে, কৃষ্ণই তাঁহাকে সে কার্য্যে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। একমাত্র কৃষ্ণের পরামর্শানুসারেই অর্জ্জুন পুনরায় জ্ঞাতি হননে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যাঁহার পরামর্শে ও প্ররোচনায় অসংখ্যজীব বিনষ্ট হইল, তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত নয় ত কি।" এ কথার অসারতা প্রতিপাদন করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার

(৬) রাধন, সাধনে প্রাপ্তৌ তোষে পূজনে। রমণ—রম + ক্ত—রত। যিনি ঈশ্বর সাধিকা, ঈশ্বর প্রাপ্তা, ঈশ্বরে তুষ্টা এবং ঈশ্বরপূজাপরায়ণা, তিনিই রাধা। এই রাধায় যিনি রত— এই রাধার পূজাদি গ্রহণে যিনি রত, তিনই রাধারমণ।

নহে। অর্জ্জুন যুদ্ধে এবং জ্ঞাতিবধে অনিচ্ছুক হইলে, কৃষ্ণ যে যে কথায় তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সেই টুকু একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই প্রতিপক্ষগণ ইহার সদুত্তর প্রাপ্ত হইতে পারেন। কৃষ্ণ কহিতেছেন ;—"অর্জ্জুন! এ জগতে কেহই কাহাকে ধ্বংশ বা জীবিত করিতে পারেনা। তাহা ঐশ্বরীক নিয়মে সংসাধিত হইয়া থাকে। তবে কারণ না হইলে কখনও কার্য্যোৎপাত্ত হয় না বলিয়া, প্রত্যেক কার্য্যে এক একটী নিমিত্ত কারণ প্রয়োজন করে। কুরুকুল পূর্ব্ব হইতেই বিনষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তুমি কেবল নিমিত্তকারণ রূপে লৌকিক সমরে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে মাত্র ; পাপই মৃত্যু, এবং ধর্ম্মই অমৃত। কুরুকুল পাপার্জ্জন করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবার সমস্তই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। তুমি কেবল উপলক্ষ মাত্র হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। তুমি জ্ঞাতিবধ পাপ বলিয়া বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু পাপীর নিধন না করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া কি এতদাপেক্ষা অধিকতর পাপজনক নহে! তুমি বুদ্ধিমান, এবং শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব কি জন্য এমন নির্ব্বোধের ন্যায় কথা কহিতেছ! যাহাতে সংসারের হিত, ঈশ্বরের বাসনা এবং তোমার প্রার্থনা এক ক্ষেত্রে একত্রযোগে পূর্ণ হয় তাহার উপলক্ষ স্বরূপ তুমি কুরুকুল ধ্বংসে নিযুক্ত হও, অতঃপর জ্ঞাতিবধ বলিয়া কোনও শঙ্কা করিও না।" এই কথা কয়েকটীর মধ্যে অবৈধবাদ কিছুই নাই! ইহাতে এমন কোন কথা নাই, যাহাতে তাঁহার চরিত্রে দোষ অর্পিতে পারে। প্রত্যুত, অর্জ্জুনের উপদেশার্থ কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা জ্ঞানীগণের সর্ব্বথা অনুমোদনীয়। ইহাতে অসত্য বা ধর্ম্ম-

বিগর্হিত কিছুই নাই। সাংসারিক ক্রিয়াসক্ত ও মায়ামোহবহুলাদির বিসদৃশ হইলেও মুমুক্ষুগণের ইহাই প্রার্থনীয়, সুতরাং একার্য্য হেতু, কৃষ্ণ চরিত্র কলঙ্কিত হইতে পারে না।"

আর একটী কথা লইয়া সাধারণে বড় গোলোযোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন "কৃষ্ণেরই পরামর্শানুসারে রজনীযোগে অন্যায় পূর্ব্বক জরাসন্ধবধ সমাধা হইয়াছিল। ভীম, অর্জ্জুন এবং কৃষ্ণ স্নাতকব্রাহ্মণ বেশে গোপন ভাবে জরাসন্ধগৃহে সমুপাস্থত হইয়া অন্যায় পুর্ব্বক তাহাকে নিধন করিয়াছিলেন।"

বাস্তবিক যদি এঘটনা সত্য হয়, যদি কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে ঈদৃশ ধর্ম্মবিগর্হিতাচরণে জরাসন্ধের নিধন সাধন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরাও মুক্তকণ্ঠে বলিব, কৃষ্ণ চরিত্র কলঙ্কিত— এতগুণ সত্বেও তিনি এই অমোচ্যকলঙ্কে নিতান্তই কলঙ্কিত!

বাস্তবিকই কৃষ্ণ, ভীমার্জ্জুনসহ জরাসন্ধবধে যাত্রা করিয়াছিলেন। সঙ্গে সৈন্যসামন্ত লননাই, আবশ্যকও ছিল না;— যাহার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বৃষ্টিবংশ রৈবতক পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, যাহার ভুজবলে রাজন্যগণ সর্ব্বদা নতশির থাকিতেন, সেই জরাসন্ধের যুদ্ধে কৃষ্ণ সৈন্য লন নাই কেন! ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার নহে। সহজ বুদ্ধিতেই বিবেচনা করা যাইতে পারে, যে, যে পাপী দুর্দ্দান্ত, তাহারই শাস্তি একান্ত কর্ত্তব্য। যে নির্দ্দোষ—নিষ্পাপ তাহার শাস্তি কেন হইবে? জরাসন্ধ দুর্দ্দান্ত পাপী, তাহারই শাস্তি হইবে, কিন্তু তাহার সৈন্যগণ তৎসহ কেন দণ্ডিত হইবে? সৈন্যসহ জরাসন্ধবধে যাত্রা করিলে অবশ্যই প্রকাশ্যভাবে সৈন্যে সৈন্যে মহাযুদ্ধ হইত, এবং

অবশ্য বহুসৈন্য অন্যায়রূপে বিনষ্ট হইত। পাণ্ডব ও মাগধ সৈন্য সর্ব্বতোভাবে দোষশূন্য হইয়াও বিনাশ প্রাপ্ত হইত, এই জন্যই কৃষ্ণ সসৈন্যে যাত্রা না করিয়া, জরাসন্ধকে মাত্র দণ্ডিত করনার্থ তিন জনেই যাত্রা করিয়াছিলেন।

তাহার পরের কথা ভীমার্জ্জুনের স্নাতকবেশে আত্মগোপন করিয়া ছদ্মবেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি? ইহাও তাদৃশ দোষের নহে। কৃষ্ণ প্রভৃতি স্নাতক বেশে গিয়াছিলেন বটে, এবং সেটা ছদ্মবেশেও বটে, কিন্তু, জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই তাঁহারা স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

কোনও প্রকার অস্ত্রাদিও তাঁহারা সঙ্গে লয়েন নাই। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহাদিগের মনে কোন গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল না। মন্দ অভিপ্রায় থাকিলে—জরাসন্ধকে অলক্ষে হত্যা করিবার অভিপ্রায় থাকিলে—তাঁহারা অবশ্যই অস্ত্রাদি সঙ্গে আনিতেন। কোন অস্ত্রাদি তাঁহারা লন নাই বলিয়াই, আমরা মীমাংসা করিতেছি যে, তাঁহাদিগের কোন মন্দ অভিপ্রায় কখনই ছিলনা। হৃদয়ে মন্দ অভিসন্ধি থাকিলে শত্রুপুরীতে কে নীরস্ত্র হইয়া গমন করে?

জরাসন্ধকে যে অন্যায়পূর্ব্বক হত্যা করা হয়নাই, ইহা যাঁহারা মহাভারত সম্যক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। প্রকাশ্যস্থানে, মগধ-সৈন্য ও কৃষ্ণার্জ্জুনের সম্মুখে ভীমের সহিত জরাসন্ধের দ্বৈরথযুদ্ধ হয়। যুদ্ধও স্বল্পসময়ব্যাপী নহে। চতুর্দ্দশদিবসব্যাপী ঘোরতর সমরে জরাসন্ধ ভীম কর্ত্তৃক নিহত হন। কেহ বলেন "জরাসন্ধকে যুদ্ধার্থ সময় দেওয়া হয় নাই' সময় দেওয়া ত সামান্য কথা, যুদ্ধের

ফলাফল অনিশ্চিত জ্ঞানে, জরাসন্ধকে আপন পুত্রের রাজসিংহাসনে অভিষেক করিবার সময় পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল!! তথাপি কি কেহ বলিবেন জরাসন্ধকে অন্যায়রূপে হত্যা করা হইয়াছে? জরাসন্ধ, কুটিল, কুচক্রী কৃষ্ণের কুপরামর্শেই প্রাণ হারাইলেন? আরও বলি, কৃষ্ণ, অন্যায়হত্যার প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, ভীমের ভীষণ তাড়নে জরাসন্ধকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া ববং বাহু প্রহারে ভীমকে নিষেধ করিয়াছিলেন। জরাসন্ধের কাতরোক্তিতে পরিশেষে তিনি বিশেষ পরিতপ্ত হইয়াছিলেন। আর কি কেহ বলিবেন,—জরাসন্ধ অন্যায়সমরে প্রাণ হারাইয়াছেন—কৃষ্ণচরিত্র জরাসন্ধবধে নিতান্ত কলঙ্কিত হইযাছে?

রুক্মিণীহরণ সম্বন্ধেও কেহ কেহ কৃষ্ণচরিত্রে দোষার্পণ করিয়া থাকেন। শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ সম্বন্ধ হইল, পিতা, মাতা, অভিভাবক এবং তাঁহার দানের অধিকারী, এই সম্বন্ধমিলনে সমুৎসুক। কৃষ্ণকে কন্যাদান করিতে তাঁহাদিগের ইচ্ছামাত্রও ছিলনা, শিশুপালকে কন্যাদান করাই তাঁহাদিগের আন্তরিক অভিপ্রেত। রুক্মিণীর পিতামাতার অনভিমতে, কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিলেন! ইহা অপেক্ষা অন্যায় কার্য্য আর কি হইতে পারে? কৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্ক আর কি ইহা অপেক্ষা হইতে পারে?

এক্ষণে আমরা পূর্ব্বোক্ত যুক্তির অসারতা প্রতিপাদন করিব। অগ্রে রুক্মিণীহরণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে পাঠকগণ আপনারাই কৃষ্ণের দোষ গুণ বিচার করিতে সমর্থ হইবেন।

শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইল। রুক্মিণীর ভ্রাতা, রুক্ম এবং তাঁহার পিতামাতা সকলেই বিবাহ

প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বিবাহের যথোপযুক্ত আয়োজনও হইতে লাগিল। এদিকে রুক্মিণী কৃষ্ণগতপ্রাণা—কৃষ্ণই তাঁহার অন্তরের অভিষ্টদেবতা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের প্রাণ, জীবনের জীবন,ও সর্ব্বস্ব ধন--জীবন থাকিতে তিনি অন্যজনে পতিত্বেবরণ করিতে পারিবেন না। কৃষ্ণচরণে মনে মনে আপনপ্রাণ পূর্ব্ব হইতেই উৎসর্গ করিয়া, মনপ্রাণ কৃষ্ণগত করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন—কিরূপে তিনি অপরের পরিণীতা হইবেন? রুক্মিণী বিষম বিপদে পতিতা হইলেন। কিরূপে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবেন, কি করিলে এই বিপদবার্ত্তা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে এই চিন্তাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল।

পরিশেষে ভীষণবিপদের কাহিনী বিবৃত করিয়া কৃষ্ণ-সমীপে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল "কৃষ্ণই আমার পতি, পতিই স্ত্রীর ধর্ম্মরক্ষার কর্ত্তা, অতএব তিনি আমার ধর্ম্মরক্ষা করুন।" যিনি জগতে ধর্ম্মসংস্থাপন করিতে অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ধর্ম্মরক্ষার ভারার্পিত হইলে তিনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন? কৃষ্ণ রুক্মিণার ধর্ম্মরক্ষার্থ দৃঢ় প্রতীজ্ঞা হইলেন। কৃষ্ণ বিবাহসভা হইতে কৌশলে রুক্মিণীকে গ্রহণ করিলেন। তিনি জানিতেন যে, এখন প্রকাশ্যভাবে রুক্মিণীর সহিত বিবাহপ্রস্তাব করা তাঁহার বৃথা; সেইজন্যই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কন্যা সর্ব্বথা পিতামাতার অনুগতা ও অধিকৃতা হইলেও আত্মদান অবশ্যই তাহার স্বকরায়ত্ব। ভরসা করি, একথা বিবেচকমাত্রেই স্বীকার করিবেন, সুতরাং, একথা বুঝাইতে অনর্থক সময় নষ্ট করিব না।

কৃষ্ণচরিত্রে এইরূপ অসংখ্য দোষারোপ!--তাহা খণ্ডন করাও নিতান্ত কঠিন ব্যাপার নহে। তবে "হরিসাধনের" স্থান তাদৃশ প্রসর নহে, ইহাতে অনেক বিষয় লিখিতে হইবে, সুতরাং কৃষ্ণচরিত্রের তাবৎ বিষয় সমালোচনায় বিরত রহিলাম। বিশেষ, কৃষ্ণচরিত্র সুযোগ্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক অতি সুবিস্তৃতরূপে সমালোচিত হইতেছে, পাঠকগণ তাহাতেই সে সকল দেখিবেন, তবে প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে দুই একটী কথা উল্লেখ করিলাম মাত্র।

যিনি সর্ব্বপ্রকারে পাপশূন্য, যিনি—পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং—ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায়—অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার চরিত্র নির্ম্মল, যিনি আদর্শধার্ম্মিক, আমরা তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম বলিতে প্রস্তুত আছি। যে যে গুণ থাকিলে, যে প্রকার কার্য্য কলাপ দর্শন করিলে ঈশ্বর বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে; কৃষ্ণচরিত্রে তৎসমস্তই বর্ত্তমান, সেই জন্যই আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, অন্যান্য অবতার ঈশ্বরের অংশবিশেষ হইলেও পূর্ণ নহেন, কেবল এক মাত্র কৃষ্ণই পূর্ণ ব্রহ্ম। আইস ভাই! আমরা ভক্তিভরে যুক্তকরে, সেই বিশ্বময় এবং সর্ব্ব গুণাধার শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণত হই। সেই রাধারমণ, পাপী তারণ, মধুসূদনের পদে স্মরণ গ্রহণ করি। আমরা কায়মনে হরিগুণ গানে নিযুক্ত হই। হরিই পূর্ণ ব্রহ্ম, তিনি শাক্তের শক্তি, শৈবের শিব, বৈষ্ণবের হরি, খৃষ্টানের যিশু, ব্রাহ্মের ব্রহ্ম, মুসলমানের মহম্মদ, এবং আধারের আধেয় ও আধেয়ের আধার। যেমন পৃথিবীর সকল নদ নদী পূজ্য বা অপূজ্য প্রবাহে বাহিয়া বাহিয়া সর্ব্বশেষে একই অনন্ত প্রবাহে মহাসমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মারাধ্য মূর্ত্তিই এই

হরি সাধন

এক সর্ব্বময় হরির বিরাটমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য আর নাই। তাই বলি-তেছি, সকল জাতি—সকল ধর্ম্মাক্রান্ত জীব,—আইস হরি সাধন করি, হরির চরণ সাধন করিয়া অনন্ত ফল লাভ করি। বল ভাই হরি! হরি!! হরি!!!

সাতশতবৎসরব্যাপী ঘোর পরাধীনতায়, বিজাতীয় ধর্ম্মের ভীষণ সংঘর্ষণে হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মের প্রবল আন্দোলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানসময়ে, যদিও চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের আন্দোলন হইতেছে, যদিও স্থানে স্থানে হরিসভা ধর্ম্মসভাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুফলপ্রসবের সূত্রপাত হইতেছে, যদিও কয়েক জন মহাত্মা নিঃস্বার্থভাবে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তথাপি তদ্দ্বারা তাদৃশ কোন ফল হইতেছে না। এক্ষণে ধর্ম্মবিষয়ে অধিকতর আন্দোলন হওয়া আবশ্যক। যাঁহাদিগের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্ম স্থান পায় না, যাঁহারা ভ্রমবশতঃ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ রোপণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ আয়ত্ত করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া ধর্ম্মের জ্যোতি হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ধর্ম্মপ্রচার দ্বিবিধ প্রণালীতে সাধন করা যাইতে পারে বাচনিক এবং লিখিত। বাচনিক উপদেশ অপেক্ষা লিখিত উপদেশ অধিকতর ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, তাঁহারা যে, এক দিনের উপদেশে তাহা আয়ত্ত করিতে পারিবেন, ইহা কল্পনা

সম্ভবপর নহে। প্রতিদিন উপদেশ শ্রবণ ও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবার অবকাশও অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা। অবকাশ থাকিলেও আবার উপদেষ্টার অভাব সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এমত স্থলে লিখিত উপদেশ পূর্ণ কোন গ্রন্থ তাঁহারা প্রাপ্ত হইলে, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের তাবত সন্দেহই ভঞ্জন হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে বাচনিক উপদেশ অপেক্ষা লিখিত উপদেশ অধিকতরফল প্রসবে সমর্থ বলিয়াই, এবং তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্যই এই "হরিসাধন" প্রণীত হইল। ইহা দ্বারা পাঠক কতদূর ফলপ্রাপ্ত হইবেন, তাহার পরিমাণের ভার পাঠকের উপরেই বিন্যস্ত রহিল,—ফলতঃ ইহাতে সাধকের বিন্দুমাত্র উপকার দর্শিলেই গ্রন্থকারের উদ্যম সার্থক।

ধর্ম্মই মানবের একমাত্র বন্ধু। ধর্ম্মশূন্য জীবন জীবনই নহে। অসার সংসারে ধর্ম্মই কেবল একমাত্র সার। মানবমাত্রেরই এই পরমবন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পরম শান্তি-সুখ অনুভব করা প্রয়োজন। ধর্ম্মের সহিত বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মানবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥"

উৎসব, ব্যসন, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজদ্বার এবং শ্মশানে যিনি মানবের সঙ্গে থাকিয়া অনুষ্ঠাতার মঙ্গলবিধান করেন, তিনিই বন্ধু। ধর্ম্মই এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উল্লিখিত কার্য্যসমূহে ধর্ম্ম সহায় থাকিলে অনুষ্ঠাতার অনুষ্ঠিত বিষয়ে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। তাই বলিতেছিলাম—ধর্ম্ম

মানবের একমাত্র বন্ধু।"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্ম নিধনে অনুযাতি যঃ।" ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ! যাহা নিধন হইলেও অনুগমন করিয়া আপত্তিক কৃতকর্ম্মের ফলাফল প্রদান করে। অতএব এই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা মানবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য,—ধর্ম্মজ্ঞান হইয়া শ্রীহরির ধ্যানে, তৎ চরিতামৃতপানে হৃদয়ে পবিত্র শান্তিলাভ হয়। সংসারের ভীষণ যন্ত্রণার অবসান করিয়া মন নিয়ত পবিত্র হরিনামে বিমোহিত করিয়া শান্তিসুধা সেবন করা মানব মাত্রেরই আবশ্যক।

দ্বিতীয় ভাষ।

যাঁহার পক্ষপাতশূন্য স্বাভাবিক বিধান বলে, জীব কৃতকার্য্যের ফলাফলানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হইতেছে, যাঁহার অসামান্য কৌশলে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্য সংসাধিত হইতেছে, যাঁহার পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে, মানব মোক্ষধামে গমন করে, যিনি জীবের সুখদুঃখের নিয়ন্তা, বিশ্বের বিধাতা, যাঁহার কৃপায় জীব চতুর্ব্বর্গ পায়, যে হরিসাধনে হৃদয়ে শান্তি, পরকালে মুক্তি এবং ভবযন্ত্রণায় অব্যাহতি পায়, সেই হরি প্রবর্ত্তিতধর্ম্মকথাই এই "হরিসাধনের" উদ্দেশ্য এবং তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

জীবের উচ্চ ও শেষ প্রার্থনা মুক্তি। যাহাকে আর এই পাপতাপপূর্ণ ভবধামে পুনরাগমন করিতে হয় না, সাংসারিক মায়ামোহ, বিষাদ কষ্ট হইতে যিনি সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, সাংসা-

রিক বন্ধন যাঁহাকে আর কখনও বিভীষিকা দেখাইতে পারে না, তিনিই মুক্ত। মুক্তি জীবের একমাত্র প্রার্থনীয়। হরিসাধন সেই মুক্তির সেতুস্বরূপ। হরিসাধনে মুক্তিনিশ্চয়, সেই জন্য "হরি-সাধন" মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

এক্ষণে, হরি কে? এবং তিনিই যে বিশ্বময়, তিনিই যে পূর্ণ পরাৎপর, ইহাই আপাততঃ বিবেচনা করা যাউক। পূর্ব্ব বর্ণনায় যদিও হরির পূর্ণব্রহ্মত্ব কিয়ৎ পরিমাণে সূচীত হইয়াছে তথাপি পুনর্ব্বার তাহা বিশদ করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। হরিকে লৌকিক দৃষ্টিতে যাঁহারা দেখেন, তাঁহাবা হরিকে নিতান্ত ভণ্ড ও কলঙ্কিত বলিয়াই জানেন। হরির চরিত্র হৃদয়ে স্মরণমাত্রেই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন, হরিনামে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত যে, হরি চরিত্র কি নিমিত্ত বিকৃত এবং তাঁহাদিগের ঘৃণাভাজন হইয়াছে। তাঁহাদিগের ভ্রমসংসোধনার্থ যে আমরা কৃষ্ণচরিত্র বিবৃত করিতে অগ্রসব হইতেছি, তাহা নহে, কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন, আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই বিশ্বাস। তবে কৃষ্ণনিন্দুগণ যদি ঘৃণা পরিহার করিয়া একবার ইহা দর্শন করেন, তাহা হইলে আমরা নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইব।

হরিসাধনে-বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি। বৈষ্ণব—বিষ্ণুভক্ত। হরি ও বিষ্ণুতে অভেদ। * বৈষ্ণবধর্ম্মেরপ্রধান ভিত্তি—প্রেমে। হরি

---

* এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

সাধক, প্রেমিক, হরি—প্রেমিক চূড়ামণি। এই প্রেমময়ধর্ম্ম বার্দ্ধক্যের অবলম্বনীয় নহে, যৌবনেই বৈষ্ণবধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি। যৌবনকাল, যিনি ধর্ম্মার্জ্জনের বিঘ্নকাল বলেন, তিনি ভ্রান্ত। যৌবনেই সকল ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি। যখন বৃত্তিসমূহ স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকে, তখনই ধর্ম্মের তাবৎ তত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ে স্থান পায়। নতুবা ধর্ম্মের অধিকাংশ তত্ত্ব, তাঁহার সঙ্কুচিত বৃত্তির অতীত অবস্থায় অবস্থান করে, সুতরাং বৈঞ্চবধর্ম্মের শিক্ষা, দীক্ষা ও তাহার বিশ্বজনীন ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে, যৌবনকালই প্রশস্ত। যৌবন কাল—প্রেমের কাল। এ সময় সদসৎ বৃত্তি স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, এই সময় হৃদয় যে দিকে লইয়া যাইবে, সেই দিকেই তদ্রূপ কার্য্য সংসাধিত হইবে। অসৎ দিকে মনকে ধাবিত করাইলে, তিনি অসৎ বৃত্তির প্রতিমূর্ত্তি হইতে পারেন, সদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলে তিনি সদ্‌বৃত্তির আদর্শ হইতে পারেন। তাই বলিতেছি, ধর্ম্ম শিক্ষার্থ যৌবনকালই প্রশস্ত; এই সময় ধর্ম্মবিষয়ে মনঃসংযোগ করিলে মানব আদর্শ-ধার্ম্মিক মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। কার্য্যসাধনক্ষম বৃত্তি সংকুচিত ও দমিত করাই মনুষ্যত্ব, কার্য্যসাধনে অসমর্থ যে বৃত্তি, তাহার দমন করণে মনুষ্যত্ব কি? সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া যিনি নির্লোভী, তিনিই মনুষ্য। প্রলোভনের অবর্ত্তমানে যিনি লোভশূন্য—তাঁহার পুরুষত্ব কোথায়? কেহ বলেন "ঈশ্বরে ভয়ই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যিনি জাগতিক যাবতীয় কার্য্যের পরিচালক এবং দণ্ডবিধাতা, সেই হরিকে সর্ব্বতোভাবে ভয় করিয়া চলাই যুক্তিসিদ্ধ এবং ধর্ম্ম সঙ্গত।" কেহ বলেন, "হরির অনন্ত মহাশক্তি চিন্তা করিয়া, আপনার ক্ষুদ্রত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি

করিয়া, তাঁহার নিকট স্বকীয় ক্ষুদ্রত্ব ভাব প্রকাশ করাই ধর্ম্ম এবং মুক্তিলাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়।” কেহ বলেন “হরিকে পিতার ন্যায় ভক্তি করাই ধর্ম্মের লক্ষণ এবং তাহাই একমাত্র মুক্তিলাভের সেতু।” আর আমরা বলি, হরিতে প্রেম ও প্রীতি করাই মনুষ্যত্ব। তিনি প্রেমময়—সাধক তাঁহাকে শঙ্কাশূন্য হৃদয়ে প্রেম করিবেন। তিনি বৈকুণ্ঠবিহারি, তাঁহার নিকট কুণ্ঠা নাই আশঙ্কা নাই, ভয় নাই। তিনি সাধককে মাতার ন্যায় স্নেহ করেন। মাতার নিকট কি পুত্রের ভয় থাকে? তিনি প্রেমিক চূড়ামণি, প্রেমেই তিনি সকলের বাধ্য, ভয়ে বা দাসত্বে নহে। হৃদয়ে, তাঁহার প্রেমময়মূর্ত্তি স্থাপন এবং একমনে তাঁহার চরণে প্রেমমালা ভক্তিসহকারে উৎসর্গ করাই, বৈষ্ণব ধর্ম্মের একমাত্র উক্তি।

প্রেম মানবের স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি। নায়কনায়িকার মধ্যে যে পবিত্র প্রেম, তাহাই সদ্‌গতির সেতু। সে প্রেম হরির প্রতি অর্পণ করিলে সদ্গতি লাভে সমর্থ হওয়া যায়। যৌবনে হৃদয়ের সেই নিত্যপ্রেমময় ভাব, সেই মধুর হাসি, সেই বিলাসের মত্ততা শরীরের আবেশ, সেই হৃদয়ের সর্ব্বত্র প্রেমের রাজ্য, সেই শিরায় শিরায় প্রেমের তড়িৎ সঞ্চার, এ সকল প্রেম—ভক্তি, হরিসাধনের প্রধান সাধন। ইহাই সাধনার চরম উপায়। সেই নায়ক নায়িকার প্রেমভক্তি,—রাধাকৃষ্ণ। রাধা আদর্শ নায়িকা কৃষ্ণ নায়ক চূড়ামণি।

রাধিকাকে আদর্শ নায়িকা বলিলাম কেন? যিনি অকৃত্রিম প্রেমের জন্য, কুলমানলজ্জাভয়, তৃণতাচ্ছিল্যে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনি আদর্শ নন্ ত কি? তাঁহার অনন্ত প্রেম

অনন্তকালপ্রদ নহেত কি ? রাধিকা কুলমান হইতে প্রেমকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি প্রেমের জন্ম কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন বলিয়াই, রাধিকা আদর্শ নায়িকা।

আর একটী কথা এস্থলে উত্থাপিত হইতে পারে, রাধিকা আয়ানের ধর্ম্মপত্নী। যিনি পরপ্রেমে মজিয়া স্বীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলেন, স্বামীকে অতিক্রম করিয়া অপরে মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন, তিনি কি বলিয়া আদর্শ নায়িকা হইবেন ?

যিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ, লোকাচার বিরুদ্ধ, অপবিত্র প্রণয়ের মোহে নিপতিত হইয়াছিলেন ; পতি, জ্ঞাতি, আত্মীয় স্বজন পরিহার করিয়া নিরন্তর প্রহৃষ্ট অন্তরে কৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন, সেই রাধিকাকে, কিরূপে আদর্শনায়িকা বলা যাইতে পারে ? কথাটা একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক ; রাধাকৃষ্ণের এই অবৈধপ্রণয় মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে যে মহতী শিক্ষা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

যৌবনের বঙ্গরস, আবেশের বিহ্বলতা, হৃদয়ের অবিকৃতা, আনন্দের উচ্ছাস, উৎসাহের উল্লাস, এ সকল যদি সংসাধনায় নিয়োজিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহাতেই অনায়াসে সদ্গতি লাভে সমর্থ হওয়া যাইতে পারে। যৌবনে সদসৎ বৃত্তির স্ফূরণে হৃদয়ের অসদ্ভাব আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইয়া থাকে।

যাহাতে সংকোচ আছে, তাহাতে মনের ত সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ঘটে না, তাহাতে ত মনের পূর্ণ আনন্দ ঘটে না, হরিকে পিতায় ন্যায় ভক্তি করিতে গেলে স্নেহ পাইতে পারি, কিন্তু

যে স্তুতিতে একটু সংকোচ আছে, মাতার ন্যায় ভক্তি করিলে তাহাতেও অল্লাধিক সংকোচ ভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু নায়কনায়িকার পবিত্র প্রেমভাবে কোন প্রকার সংকোচ নাই, দম্পতি অসন্দিগ্ধভাবে হৃদয়দ্বার উন্মোচন করিয়া পরস্পর প্রেমবিনিময় করেন; তাহাতে ভয় নাই, কুণ্ঠা নাই, নৈরাশ্য নাই। প্রেমানন্দ দানে পূর্ণপ্রেমানন্দ প্রাপ্তিই প্রেমভক্তি, এবং ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল ভিত্তি।

আয়ান ক্লীব। রাধিকা ক্লীবে বিবাহিতা; ধর্ম্মানুসারে তিনি অনূঢ়া। তাই তিনি কৃষ্ণকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া সেই প্রেমময়ের চরণে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। তিনি লোক লজ্জা, মান অভিমান, প্রেমের নিকট জলাঞ্জলী দিয়াছেন,—তথাপি ধর্ম্ম তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী। রাধিকা কুলটা—ব্যভিচারিণী নহেন, পরকীয়া—কিন্তু পরস্ত্রী নহেন।

রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণে দেহ উৎসর্গ করিয়াছেন, "তাঁহার" বলিতে জগতে আর তাঁহার কিছুই নাই। অন্য প্রার্থনাও নাই। কেবল প্রার্থনা—"নাথ! যেন বিস্মৃত হইওনা।" কৃষ্ণ বিশ্বময়, বিশ্বের সর্ব্বস্থানে তিনি। তিনি সনকসনাতনের, ধ্রুবপ্রহ্লাদের, শ্রীদামসুবলের, ভীমার্জ্জুনের, যুধিষ্ঠিরবিদুরের, কুন্তীরুক্মিণীর যিশুমহাম্মদের, জগতের প্রত্যেক জীবের তিনি। তিনি একমাত্র রাধিকার নিকট সীমাবদ্ধ অবস্থায় থাকিবেন কেন! রাধিকাও তাহা চাহেন না, তাঁহার একমাত্র ভিক্ষা, একমাত্র প্রার্থনা "নাথ! দাসীকে মনে রাখিও।" ইহাই পবিত্র প্রেম! এ প্রেমের সহিত জগতের আর কিছুরই তুলনা হয় না। তুমি প্রমোদগৃহে আনন্দে কাল যাপন কর, তোমার দেখালে

আনন্দদান করিবার অনেক আছে, সেই প্রমোদগৃহ হইতে যখন তুমি নিশীথে প্রত্যাগমন কর, তিনি তোমার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকেন! কেন?—তোমা ভিন্ন তাঁহার আর যে কেহই নাই! তুমি আনন্দে বিভোর—তিনি তোমার আহার্য্য লইয়া জাগিয়া বসিয়া আছেন। তুমি যদি না আইস, তুমি যদি সে আনন্দ ভঙ্গ করিয়া, তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে না আইস, তিনি তবুও তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। পল যায়, দণ্ড যায়, প্রহর যায়—তবুও বসিয়া থাকেন। চন্দ্র উদয় হইয়া তাঁহাকে যেখানে যে অবস্থায় দেখে, অস্ত যাইবাব সময়ও তাঁহাকে সেই থানে সেই অবস্থায় দেখিয়া যায়। শেষে চন্দ্র অস্তযায়, নক্ষত্রগণ একে একে অনন্তনীলাকাশে মিলাইয়া যায়, দিগঙ্গনাগণ নীলসাগরের পূর্ব্ব উপকুলে স্তূপাকার স্বর্ণকীরণ লইয়া ছড়াছড়ি করেন; তখন তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, একবার অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া গৃহ কার্য্যে নিযুক্তা হন। কেন? তুমি ভিন্ন তাঁহার যে আর কেহই নাই! তুমিই যে তাঁহার এক মাত্র জুড়াইবার স্থল। তাঁহার আর প্রার্থনা নাই, কেবল সেই একই প্রার্থনা—"নাথ! যেন ভুলিও না।" তুমি অন্যের হও, তোমার আরও থাকুক, কিন্তু আমি তোমাভিন্ন অন্য জানি না, নাথ! দাসীকে যেন ভুলিও না।" প্রেমের এই তন্ময়ভাবই প্রকৃত প্রেম, ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ।

এখন দেখা যাউক, প্রকৃত বৈষ্ণব দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী? বৈষ্ণব দ্বৈতবাদী হইয়াও অদ্বৈতবাদী। তাঁহার দ্বৈতবাদ প্রকৃতি এবং পুরুষ, আর অদ্বৈতবাদ সেই প্রকৃতি ও পুরুষের সমবায়। একপক্ষ নির্ব্বিকার, নিত্য ও চিৎস্বরূপ; অপর

পক্ষ বিকারযুক্ত ও অনিত্য। এক অংশ সৃষ্টীর অতীত, অপরাংশ সৃষ্টির অন্তর্নিবিষ্ট। বৈষ্ণবের পুরুষ—সৎ ও চিন্ময়, প্রকৃতি আনন্দময়ী। যে ধামে সৃষ্টি নাই, বৈপরিত্য নাই, যে ধামে প্রকৃতি নিত্যা, চিন্ময়ী, আনন্দময়ী, প্রেমময়ী, যে ধামে চিদানন্দ নিষ্কাম, নিত্যলীলাশীল, সেই পরম ধামই বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠ। আর এই পুরুষ ও প্রকৃতির একত্রযোগে সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি, সেই বৈকুণ্ঠবিহারী। বৃন্দাবনধাম, নিত্য, সুদূর-ব্যোমদেশের বহু উপরে। তথায় প্রেমময়ী রাধিকাসহ প্রেমিক চূড়ামণি রাধারমণ চিরবিরাজিত। শুদ্ধ চিৎ বৈষ্ণবের কৃষ্ণ, আর পরা প্রকৃতি রাধিকা। প্রকৃতির অষ্টবিধ বিকৃতি শ্রীরাধার কায়ায় ব্যূহরূপে অষ্টসখি।* শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বময়—তিনি সর্ব্বঘটে বিরাজিত। শ্রীরাধাও তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সংযুক্তা। পরমধামে রাধা কৃষ্ণ বিরাজিত, তাঁহাদিগের পার্শ্বে অষ্ট সখীও অষ্ট নায়ক লইয়া রাধিকার ন্যায়) রাসলীলায় নিমগ্ন। সমগ্র জগত, সেই পরম ধামের চতুঃপার্শ্বে চক্রাকারে ভ্রমণ করিতেছে। প্রকৃতি মুহূর্ত্তে কোটী কোটী মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন, কৃষ্ণ সেই কোটী কোটী মূর্ত্তির সহিত কোটীকোটীরূপে বিরাজিত। রাসলীলা অহরহঃ চলিতেছে। প্রকাণ্ড রাসচক্রের মধ্যে ক্ষুদ্র চক্র, ক্ষুদ্র চক্রের উপর বৃহৎ চক্র, তদুপরি আরও বৃহৎ, এইরূপ অনন্তভাবে অনন্ত রাসলীলা প্রতি মুহূর্ত্তে সংঘটিত হইতেছে। মূলে সেই এক রাধা কৃষ্ণ। এক পুরুষপ্রকৃতি।

বৈষ্ণব ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা ভণ্ড নেড়ানেড়ির ধর্ম্ম বলিয়া

---

* বিস্তৃত বিবরণ স্থলান্তরে বিবৃত হইবে।—

তাচ্ছিল্য করিবার নহে। যে ধর্ম্ম প্রেমদিয়া কিনিতে হয়, যে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিলে, শুদ্ধ বিমল প্রেম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে ধর্ম্মে কোন শঙ্কা নাই, কুণ্ঠা নাই, তাহা যে শ্রেষ্ঠ, কে ইহা অস্বীকার করিবে? সেই বিশ্বময়চরিত্রবিষয়ক নিষ্কামধর্ম্মই এক-মাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম। ইহা মানবমাত্রেরই গ্রহণের উপযুক্ত।

বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় বিশ্বজনীন ধর্ম্ম. জগতে আর নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ন্যায় অনায়াসলব্ধ, স্বাভাবিকধর্ম্ম আর কোথায়ও দেখিতে পাই না।

তৃতীয় ভাষ।

হরি সাধনের উপায় কি, কিরূপেই বা হরিসাধন সাধিত হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইতেছে। অগ্রে, চিত্ত কি প্রকার অবস্থাপন্ন হইলে হরিসাধনের উপযুক্ত হয়, চিত্তের কিরূপ অব-স্থায় সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারা যায়, তাহাই লিখিত হইতেছে। চিত্তের যে অবস্থা হরিসাধনের উপযুক্ত, তাহার নাম চিত্তশুদ্ধি। চিত্ত শুদ্ধি হইলে, আর কিছুরই আব-শ্যকতা থাকেনা। চিত্তশুদ্ধি সকল ধর্ম্মের এবং ধর্ম্ম সাধনের এক-মাত্র সাধন। চিত্তশুদ্ধি হইলে, জগতের ভাবত ধর্ম্মের মর্ম্মাব-ধারণে সক্ষম হওয়া যায়। সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই চিত্তশুদ্ধি হওয়া আবশ্যক। যখন চিত্তের কোন কামনা না থাকে, চিত্ত যখন কাম ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্যাদির অতীত অর্থাৎ যখন ষড়্‌রিপু কার্য্য-কর থাকিয়াও চিত্তের বশীভূত থাকে, তখনই চিত্তশুদ্ধি

হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যখন চিত্তে কোন প্রকার সাংসারিক চিন্তা স্থান না পায়, অথচ চিত্তের তত্তাবৎ বিষয়ের চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে, সাংসারিক লোভের অতীত হইয়াও চিত্ত যখন ইপ্সিত লোভে প্রলোভিত হইবার ক্ষমতাপন্ন থাকে, ষড়রিপু যখন চিত্তের ইচ্ছাধীনে অবস্থান করে, চিত্তের তাদৃশ অবস্থার নামই চিত্তশুদ্ধি। যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ, তিনিই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মের যাবতীয় তত্ত্ব, তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখে। তিনি হরির পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবারজনী পূজা করেন, হরি প্রেমে তাঁহার চিত্ত দিবারজনী উন্মত্ত। হরি সাধনে তাঁহার সকল চেষ্টা কেন্দ্রিভূত। তাঁহার চিত্তে অন্য চিন্তার ধারণা হয়না, অন্য চিন্তার ধারণা করিতে তাঁহার চিত্ত সর্ব্বতোভাবে অক্ষম, তিনি হরিচিন্তায় একাগ্রনিমগ্ন।

যখন চিত্তে সদসৎ তাবৎ বৃত্তি স্ফুরিত হয়, যখন হৃদয়ের যাবতীয় কার্য্য ক্রিয়ান্বিত হইয়া কার্য্য সাধনোপযোগি হয়, তখনই চিত্তশুদ্ধির উপযুক্ত সময়। তখনই চিত্তশুদ্ধির অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়সংযম হইলেই যে চিত্তশুদ্ধি হইল, কেবল একমাত্র ইন্দ্রিয়সংযম হইলেই যে, ধর্ম্মিকাগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত হওয়া হইল, এমত নহে; ইহার অন্যান্য কতকগুলি লক্ষণও আছে। অনেকে ইন্দ্রিয়সংযত করিতে পারেন, তথাপি চিত্তশুদ্ধ নহে। এরূপ চিত্তশুদ্ধিতে বাসনার অস্তিত্ব হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে। বাসনার অনুশীলনে বাসনার স্ফূর্ত্তি। বাসনার কখনও অবসান হয় না, বাসনা পূর্ণ হইলে, আবার নূতন বাসনা হৃদয় ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া বাসনাকারীকে বাসনার দাস করিয়া তোলে। আমি বড় হইব, আমি লোকের

নিকট গণনীয় হইব, আমি পরমসুখে কাল যাপন করিব। এ সকল বাসনা মানবের অস্থি মজ্জার সহিত গ্রথিত। জগতের কোন্ মানব ধনী, জ্ঞানী, মান্য ও গণ্য হইতে না চাহে? কোন্ ব্যক্তি ধনবান, মাননীয় হইতে কায়মনে যত্ন ও চেষ্টা না করে? যদি বাসনা থাকিল, তবে চিত্তশুদ্ধ হইল কৈ? বাসনার দাস যিনি, বাসনা যে দিকে লইয়া যায় সেই দিকে যান যিনি, তাঁহার চিত্ত কিরূপে শুদ্ধ হইবে? তাঁহার হৃদয়ে বাসনার রাজত্ব! বাসনা যথেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে দারুণ মনস্তাপানলে দগ্ধ করে তাঁহার চিত্ত কিরূপে শুদ্ধ হইবে? বাসনাশূন্য যে হৃদয়, তাহাই চিত্তশুদ্ধির উপযোগী। যখন আপন পরে কোন প্রভেদ জ্ঞান না করিব, পরের ইষ্ট নিজের ইষ্ট জ্ঞানে অভিষ্টের চিন্তা করিতে পারিব, যখন আপনার সুখ পরের সুখে সংযুক্ত করিয়া, সেই সুখের অনুধ্যানে চিত্তকে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইব, যখন বুঝিব "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" তখনই জানিব, আমার চিত্তশুদ্ধি ঘটিতে পারে, তদুপযোগী সময় উপস্থিত! পাঠক! এই সময়েই প্রবৃত্তির মোহিনী মূর্ত্তিখানি, শনৈঃ শনৈঃ, অতিসন্তর্পণে, অন্তরের অন্তস্থল হইতে অপসারিত করিয়া, তাহার স্থানে নিবৃত্তির, ছায়াময়ী মূর্ত্তি কল্পনাদ্বারা সেই অদ্বিতীয় পুরুষ শ্রীহরির অভিষ্টপথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

চিত্তশুদ্ধির আর একটী লক্ষণ, ভক্তি। যিনি সকল শুদ্ধির স্রষ্টা, যাঁহার কৃপায় চিত্তশুদ্ধি সংঘটিত হয়, যাঁহার জন্য চিত্তশুদ্ধির আবশ্যক, তাঁহার প্রতি ভক্তিই চিত্তশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। হৃদয়ের শান্তিই চিত্তশুদ্ধির প্রধানফল। শান্তি সকল সুখের

শ্রেষ্ঠ। ধার্ম্মিকের হৃদয় শান্তির আবাস স্থল। সেই শান্তি লাভার্থই চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। তাহার পর প্রীতি। আত্মনির্ব্বিশেষজ্ঞানে সর্ব্বজীবে প্রীতি—অনন্তফলপ্রসব করিয়া থাকে। অতএব—শান্তি, প্রীতি ও ভক্তি এই তিনটী চিত্তশুদ্ধির ভিত্তি, এবং প্রধান সাধন।

ভক্তি, প্রীতি ও শান্তি সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রকর্ত্তারা কিরূপ বুঝিয়াছেন তাহা একবার দেখাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত—তৃতীয় স্কন্ধহইতে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইল। “মা! নির্গুণ ভক্তিযোগ যাহা তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। যে রূপ গঙ্গাসলিল সাগরে আসিয়া মিলে সেইরূপ কামনা ও ভেদজ্ঞান রহিত অবিচ্ছিন্ন মনোগতি ভক্তিতে, পুরুষ আমাতে আসিয়া মিলিত হয়। ইহাই নির্গুণ ভক্তিযোগ। ১০

ভক্তিযোগযুক্ত ব্যক্তির কোন কামনাই থাকে না, অধিক কি আমার সেবা ভিন্ন, তিনি সালোক্য৷ সার্ষ্টি, সমীপ্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য প্রার্থনাও করেন না। ১১

মা! এই ভক্তিযোগেই ত্রিগুণাতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে পরম পুরুষার্থ আর নাই। ১২ মা! ঐপ্রকার ভক্তির সাধন যাহা, তাহা কহিতেছি. শ্রবণ করুন। ধনোপার্জ্জন বৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান, এবং নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিষ্কাম, অহিংসা পঞ্চরাত্রোক্ত পূজাদ্বারা ১৩ আমার প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, পূজন, স্তবন, বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার(অস্তিত্ব) ভাব চিন্তাকরণ, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তির সম্মান, দীনে দয়া, আত্মতুল্য ব্যক্তির সহিত

মৈত্রতা, যম (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ) নিয়ম, (অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ) নাম কীর্ত্তন, সরলতাচরণ, সাধুসঙ্গ করণ, অহঙ্কার রক্ষা করণ ১৪ এই সকল দ্বারা ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই পুরুষ আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে বিনাশ্রমে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ১৫ যেমন গন্ধ, বায়ুযোগে স্বস্থান হইতে আসিয়া ঘ্রানকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ ভক্তিযোগযুক্তাত্মা, বিনাযত্নে পরমাত্মাকে বশীভূত করেন। ১৬ এই প্রকার চিত্ত শুদ্ধি, সর্ব্ব প্রাণীতে আত্মবৎ জ্ঞান দ্বারাই উৎপন্ন হয়, আমি সর্ব্বভূতে আত্মারূপে অবস্থান করিতেছি, অথচ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাপূজায় বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। ১৭ পরন্তু, আমি সর্ব্ব প্রাণীতে বর্ত্তমান, এবং অনেকের আত্মা ও ঈশ্বর; যে ব্যক্তি মূঢ়তা প্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমাপূজা করে, সে ভস্মে আহুতি প্রদান করে মাত্র। যে পরদেহে দ্বেষ করে, যে অভিমানী, ভিন্নদর্শী ও সকল প্রাণীর সহিত শত্রুতা করে, সে কখন শান্তি সুখ প্রাপ্ত হয় না। ১৮ হে অনঘে! যে ব্যক্তি প্রাণীসমূহের নিন্দাকারী, সে যদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যোৎপন্ন ক্রিয়াদ্বারা প্রতিমায় আমার পূজা করে, তথাপি আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইনা। ১৯ মা! এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, প্রতিমাপূজা বিফল, পুরুষ যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতস্থ আমাকে না জানিতে পারে, সেই পর্য্যন্ত সে স্বকার্য্যে রত হইয়া প্রতিমা অর্চ্চনা করিবে। ২০ পরন্তু যে মূঢ় আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে, অর্থাৎ যে পরের দুঃখে আপনার দুঃখ জ্ঞান করিতে না পারে, আমি তাহার মৃত্যু স্বরূপে তাহাকে ভয় প্রদর্শন করি; ২১ অতএব পুরুষের কর্ত্তব্য, যে

আমাকে সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামি ও সকল প্রাণীতে অবস্থিত জানিয়া দান, মান, মিত্রতা ও সমদৃষ্টি দ্বারা সকলকে অর্চ্চনা করে। ২২

---

* লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যহ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্য ব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১০
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনা ॥ ১১
সএব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১২
নিষেবিতা নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেন নিত্যশঃ ॥ ১৩
মদ্ধিষ্ণ্য দর্শনস্পর্শ পূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বে নাসঙ্গ মেন চ।
মহতাং বহুমানেন দীন নামানুকম্পয়া ;
মৈত্র্যাচৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ।
আধ্যাত্মিকানুশ্রবনান্নাম সংকীর্ত্তনার্চ্চমে,
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহং ক্রিয়য়া তথা ॥ ১৪
মদ্ধর্ম্মনো গুণৈরেতেঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্র গুণং হি মাং ॥ ১৫
যথা বাতরথো ঘ্রাণামাবৃঙ্‌ক্তে গন্ধ আশয়াৎ।
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারী যৎ ॥ ১৬
অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতসদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেহর্চ্চা বিড়ম্বনং ॥ ১৭
যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতিসঃ ;
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্ন দর্শিনঃ।

চিত্তশুদ্ধি, তাবত বৃত্তির পরিণতি ও সামঞ্জস্যের ফল। যাঁহার চিত্তবৃত্তি পরিণত হয় নাই, অথবা পরিণত হইলেও যিনি সেই পরিণত বৃত্তি সমুহের সামঞ্জস্য করিতে না পারেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইবে না, তিনি চিত্তশুদ্ধি জনিত অসামান্য ফলপ্রাপ্ত হইতে কদাচ সক্ষম হইবেন না। যিনি সসাগরা বসুন্ধরা ব্রাহ্মণকে দান করিয়াও—অত্যল্প সন্তপ্ত, তাঁহার চিত্তবিশুদ্ধ নহে। কিন্তু যিনি অঙ্কগত কপোতের বিনিময়ে স্বীয় হৃদয়মাংস দান করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার চিত্তবিশুদ্ধ হইয়াছে। যিনি অরণ্যচারী তপস্বী হইয়াও ধর্ম্ম কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্নিমুখ হইতে কমণ্ডলু রক্ষায় ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি ঘটে নাই, কিন্তু যিনি ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াও অগ্নিমুখে নিপতিত স্বীয়পুরী ভস্মসাৎ হইতে দেখিয়াও নিশ্চিন্তে ধর্ম্ম কথা কহিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারই চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র হইতে

ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ১৮
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈবতুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূত গ্রামাবমানিনঃ ॥ ১৯
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং ॥ ২০
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরং।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্ব্বিদধে ভয়মুল্বনং ॥ ২১
অথমাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ং।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥ ২২
শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ২৯ অধ্যায় ॥

এইরূপ শত শত প্রমাণ প্রযুক্ত হইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথা এস্থলে লিখিত হইল না।

চিত্তশুদ্ধি হরিসাধনের প্রধান সাধন। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে অন্য কোন প্রকার সাধনার প্রয়োজন হয় না। কেবল মাত্র চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। অতএব মানব মাত্রেরই চিত্তশুদ্ধি অনুষ্ঠেয়।

চিত্তশুদ্ধিই মুক্তি লাভের এক মাত্র সেতু। যাহাতে চিত্ত-শুদ্ধ হয়, যাহাতে চিত্তে কোন প্রকার মালিন্য না থাকে, বিষয় বাসনা স্থান না পায়, হৃদয় কামক্রোধাদির লীলাক্ষেত্র না হয়, তাহার অনুষ্ঠান মানব মাত্রের একমাত্র ব্রত হওয়া কর্ত্তব্য। সেই ব্রতফলই মুক্তি। অন্যথায়; চিত্তবিশুদ্ধ না হইলে কোন অনু-ষ্ঠানই কার্য্যকর হয় না, সকলই বিফলীভূত হইয়া কেবল অনু-ষ্ঠাতার হৃদয়ে বিজাতীয় দুঃখের অবতারণা করে। তাই বলিতে ছিলাম, চিত্তশুদ্ধি, হরিসাধনার সেতু স্বরূপ।

চতুর্থ ভাগ।

একণে, হরিসাধনের ফল কি, তাহাই বিবৃত হইতেছে। উন্নতি বিষয়ে জীবের গতি, পাঁচটী। সালোক্য অর্থাৎ এক লোকে বাস, সাযুজ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হওয়া,

সামীপ্য অর্থাৎ সমীপবর্ত্তি হওয়া, সার্ষ্টি অর্থাৎ ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য্যভাগী হওয়া এবং নির্ব্বাণ অর্থাৎ সর্ব্ব-বিষয়ে নির্ম্মুক্ত হওয়া। সর্ব্বাপেক্ষা এই নির্ব্বাণই বাঞ্ছনীয়। হরিসাধনে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। হরিসাধনে জীবের অস্তিত্ব থাকে না, এক লোকে বাস বা ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তি হওয়া, এ সকল মুক্তব্যক্তি পক্ষে গণনীয় নহে। মুক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই থাকে না। নির্ব্বাণ পাইয়া আত্মা, পরমাত্মায় মিসিয়া যায়। আত্মা কিরূপে এতাদৃশ উন্নতি লাভ করে, তাহাই দেখা যাউক। যে আত্মা সংসারের বাসনা শূন্য, যাহার হৃদয় সংসারের মায়া হইতে বিচ্ছিন্ন, যিনি জীতচিত্ত, তিনিই মুক্তি পাইবার যোগ্য। উল্লিখিত গুণবিশিষ্ট আত্মা, মৃত্যুর পর ক্রমশঃ উন্নতি পথে আরোহণ করিয়া একমাত্র মুক্তির দিকে ধাবিত হয়। শরীরে রিপু প্রভৃতি সংসার বন্ধনী যাহা ছিল, দেহবিযুক্ত আত্মার সে সকল কিছুই থা কে না. তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি কিছুই নাই, ঐন্দ্রিক কার্য্য সাধনা তাহার ক্ষমতার অতীত। কেবল থাকে—বাসনা, সে বাসনা সংসারিক তুচ্ছ বাসনা নহে। মুক্তির বাসনা—সে বাসনা, বাসনা নামে আখ্যাত হইতে পারেনা। তাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোন প্রভেদ নাই। সকল বিষয়েই তিনি ঈশ্বরের সহিত একমত।

আত্মা, যাহা মুক্তি পাইবার যোগ্য, তাহা দেহত্যাগ করিয়া প্রথমে সালোক্য প্রাপ্ত হয়। আত্মা সেই নিত্যধামে গমন করিয়া এককল্প বসতি করে। তাহারপর আত্মা ক্রমশঃ উন্নিত হইয়া যথাক্রমে সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বশেষে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বাণমুক্ত আত্মা—অনন্ত হরিচরণে লীন

হইয়া যায় যে আত্মার পৃথক অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে না।

হরি—অদ্বৈত হইয়াও দ্বৈতরূপ। যখন সৃষ্টিকার্য্য সাধনার্থ তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি রূপ ধারণ করেন, তখন তিনি দ্বৈত। আর যখন সেই প্রকৃতিপুরুষের একত্রসম্মীলন ঘটে, তখন তিনি অদ্বৈত। জগতের যতগুলি দেবী আছে, তৎ সমস্তই প্রকৃতির— আর দেবতা মাত্রেই পুরুষের প্রতিকৃতি স্বরূপ। পুরুষের এক একটী গুণে এক একটী কার্য্যভার লইয়া এক একটী দেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আবাব সেই দেব দেবীর একত্র সম্মিলনে পূর্ণহরির অস্তিত্ব বর্ত্তমান। তিনি দুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রী; আবার তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। তিনি যখন প্রকৃতি—তখন দ্বৈত, অনন্ত কার্য্যে নিযুক্ত, আবার যখন তিনি অদ্বৈত, তখন তিনি নির্ব্বিকার নিত্য ও নিষ্কলঙ্ক যখন তিনি প্রকৃতি, তখন তাঁহার মূর্ত্তি ছিন্নমস্তা, ভৈরবী প্রভৃতি, আবার যখন তিনি পুরুষ, তখন তাঁহার মূর্ত্তি—কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি। প্রত্যেক দেবীর অভ্যন্তরে এক একটী গুপ্তসত্য রূপকজালে আবৃত রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে সত্যনিষ্কাসন করিলে এ সকল তত্ত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। আবার সেই দুর্গা বা ভৈরবীর কার্য্যাদিও পুরুষে (হরিতে) সম্যক্ আরোপ করিয়া দেব দেবীর একত্র সামঞ্জস্যও কঠিন ব্যাপার নহে।

এক একটী দেবীর কার্য্য এক একটী অবতারের কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্য রহিয়াছে। একটী মহাবিদ্যায় যে কার্য্য সাধন করিলেন, একটী অবতার দ্বারা ও সেই কার্য্য সাধিত হইয়াছে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, সেই অবতার ও মহাবিদ্যার সামঞ্জস্য আছে। সেই অবতার ও মহাবিদ্যা পুরুষ ও প্রকৃতি ভেদে

বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও একই প্রকৃতি বিশিষ্ট, এক কার্য্য সাধনার্থই নিযুক্ত। প্রথমতঃ, দশ অবতারের কার্য্য বুঝি। তাহার পর দশমহাবিদ্যার কার্য্য সমালোচন ও অবতারের কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিব।

দশ অবতারের কার্য্য, রূপ ও অভ্যুত্থানকাল পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, সৃষ্টির ক্রমবিকাশ সাধনার্থই এবং সৃষ্টির বিধানার্থই তাঁহারা অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, একে একে একথা বুঝা যাউক।

সর্ব্বাগ্রে বলিয়া রাখা উচিত যে, ক্রমবিকাশ বলে, জগত যখন যে অবস্থায় উপনিত হইয়াছে, অবতারও তখন তদুপযোগী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সৃষ্টী রক্ষা করিয়াছেন।

জীব সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের* যে কি অবস্থা ছিল, তাহা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একশত উনত্রিংশ সূক্তের কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

ন অসদ্ নোসদ্ আসীৎ তদানীং
নাসীদ্ রজো নো ব্যোমা পরোযৎ।

---

*যদব্ভাব গতো জীবস্তত্ভাব গতো হরিঃ।
অবতীর্ণ স্ব শক্ত্যা স ক্রীড়তীব জনৈসহ॥
মৎস্যেষু মৎস্যভাবোহি কচ্ছপে কুর্ম্মরূপকঃ।
মেরুদণ্ডে যুতেজীবে বরাহ ভগবান্ হরিঃ॥
নৃসিংহ মধ্যভাবেঽহি বামনঃ ক্ষুদ্র মানবে।
ভার্গবোঽসভ্যবর্গেষু সভ্যো দাশরথীস্তথা॥
সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্নে কৃষ্ণেস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
তর্কনিষ্ঠ নরেবুদ্ধ নাস্তিকে কল্কিরেব চ॥

কিম্ আবরীবঃ কুহকস্য শর্মন্নম্ভঃ কিম
আসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥ ১
ন মৃত্যুর আসীদ্ অমৃতং ন তর্হিন রাত্র্যাঃ
অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আসীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একং তস্মাদ্ হ
অন্যদ্ ক পরঃ কিঞ্চনাস ॥ ২
তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়ম্ অগ্রে অপ্রকেতং
সলিলং সর্ব্বং আ ইদম্।
তুচ্ছেন আভূ আপহিতং যদ্ আসীৎ তপসস্
তদ্ মহিমা অজায়তৈ কম্ ॥ ৩
কামস্ তদ্ অগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ
প্রথমং যদ্ আসীৎ।
সতো বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন্ হৃদি
প্রতীষ্যাকবয়ো মনিষা ॥ ৪
তিরশ্চীনো বিততো বশ্মির এষাম্ অধঃ স্বিদ্
আসীদ্ উপরি স্বিদ্ আসীৎ।
রেতোধাঃ আসন্ মহিমানঃ আসন্ স্বধা
অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫
কো অদ্ধা বেদ কঃ ইহ প্রবোচৎ কুতঃ
অজাতা কুতঃ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

অর্ব্বাগ্ দেবাঃ অস্য বিসর্জ্জনেন অথা
কো বেদ যতঃ আবভুব ॥ ৬
ইয়ং বিসৃষ্টির যতঃ আবভুব যদি বা
দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭

ঋগ্বেদ। ১০মঃ। ১২৯ সূঃ।

সেই আদিতে সৎ, অসৎ, রজো বা ব্যোম কিছুরই অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল না। তবে কিসের দ্বারা আবৃত ছিল? অথবা এ সকল বীজ কোন্ বস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থাপিত ছিল? সে, কি জল?—না গভীর গহ্বর? হয়ত তখন মৃত্যু বা অমৃতত্ব ছিল না, রাত্রি দিবার ভেদ ছিল না, কেবল যাঁহার অন্যতর বা ঊর্দ্ধে কিছু নাই, যিনি আপনাতে নির্ভর করিয়া শ্বাস ক্রীড়ায় নিরত, সেই তিনিই কেবল বর্ত্তমান ছিলেন। অগ্রে অন্ধকার—নিবীড়ান্ধকারে নিমজ্জিত এবং সর্ব্বত্র সলিল দ্বারা আবরিত ছিল। যিনি তুচ্ছস্বরূপ এবং তুচ্ছদ্বারা আবৃত ছিলেন, তিনি তপোদ্বারা পরিপুষ্ট হইলেন। মনের প্রাথমিক বীজ, কাম, সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন এবং কাম হইতে রেতঃ উৎপন্ন হইল। সদসদের সংযোগ রজ্জু স্বরূপ ইহার অবস্থান, ইহার অনুভব কবিগণ স্ব স্ব হৃদয়ে বুদ্ধি দ্বারা করিয়াছিলেন। যে রশ্মি জগৎব্যাপ্ত হইয়া বিস্তৃত, তাহা কি অধোতে না উপরে অবস্থাপিত ছিল? রেতঃ, মহিমা, এবং স্বধা কি নিয়ে, ও মহাশক্তি ঊর্দ্ধে ছিল? এ সৃষ্টি কোথা হইতে সমুৎপন্ন

হইল? কেইবা সৃষ্টি করিল? কে বলিতে পারে? দেবতারও ত তাহা সাধ্য না? তাঁহারা ত সৃষ্টির পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন!! অতএব তাঁহারাই বা কেমন করিয়া কহিবেন। অতএব সে কথা বলিবে কে? যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ, যিনি স্বর্গে; তিনি কি এতত্ত্ব অবগত আছেন, হয়ত তিনিই ইহা জ্ঞাত আছেন, অথবা তিনি ইহা না জানিতে ও পারেন?" এই ত গেল সৃষ্টির প্রথম কথা, তাহার পর হইতে অবতারের সৃষ্টি।

জগতের যখন উল্লিখিত ভাব, জগত যখন কেবল মাত্র অনন্ত বারীরাশিতে সমাচ্ছন্ন, তখনই মৎস্য অবতারের আবির্ভাব। ইহাই ক্রমবিকাশের প্রথম সূত্র। তাহার পর যখন জলভাগ হইতে স্থলভাগ বিচ্ছিন্ন হইল, তখন অবতার কূর্ম্ম। তাহার পর যখন স্থল ভাগে বৃক্ষসমূহ সমুৎপন্ন হইল, তখনকার অবতার—বরাহ। তৎপরে যখন সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষসমূহ বৃহদাকার ধারণ করিল, যখন সেই অরণ্যের সর্ব্বত্র দৈত্যাকার, নগ্ন, দুর্দ্দান্ত, এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মানব (কেহ কেহ বলেন সৃষ্টির প্রথমে বানর জন্ম গ্রহণ করে, পরন্তু বানর হইতে সৃষ্টির সর্ব্বাগ্রপ্রসূত মানবের প্রভেদ অতি অল্পই ছিল) জন্মগ্রহণ করিল, তখনকার অবতার নৃসিংহ (নৃমর্কট) তাহার—পর, সেই বানরাকৃতি মানবে, ক্রমবিকাশবলে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু উন্নত মানব উৎপন্ন হইল, তখন অবতার হইলেন, —বামন। তাহার পর সেই মানবসমূহ যখন দুর্দ্দান্ত এবং অসভ্য, তখন অবতার—ভার্গব! (পরশুরাম) মানব অসভ্য সম্প্রদায় হইতে যখন সভ্যশ্রেণিতে সমানিত হইল, তখন অবতার—রাম। রামাবতারের সময় সময় হইতে মানব যখন জ্ঞান

বান এবং বিজ্ঞানবিদ্ হইল, তখন অবতার হইলেন, কৃষ্ণ। তাহারপর, যখন জনসাধারণ তার্কিক হইয়া উঠিল, যখন সাধারণে তর্ক ভিন্ন কোনও কথাই বিশ্বাস করিতে চাহেনা, তখন অবতার—বুদ্ধ। আর যখন, জগত, নাস্তিক মানবে পরিপূর্ণ হইবে, যখন জীবসম্প্রদায় হরিতে অবিশ্বাস, ধর্ম্মে তাচ্ছিল্য এবং বিবিধ দুষ্ক্রিয়াসাধন করিবে, তখন অবতার হইবেন—কল্কি। সে সকল ভবিষ্যকথায় আর কাজ নাই।

এখন, অবতারগণের কে কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া লই। যখন মহাত্মা বৈবস্বত মনুর রাজত্ব, তখন প্রলয় হইতে সৃষ্টিরক্ষার্থ মৎস্য অবতারের অবির্ভাব। মৎস্য আপন শৃঙ্গে বৈবস্বত মনু কর্তৃক জগতের প্রত্যেক জীব পরিপূর্ণ তরণী আবদ্ধ করিয়া সেই প্রলয় হইতে জীবগণকে রক্ষা করিলেন। তাহার পর, কূর্ম্মাবতার। কূর্ম্মাবতারও আপনপৃষ্ঠে ধরাকে ধারণ করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিয়াছিলেন। বরাহ অবতার—দন্তাগ্রে জগত ও বেদ চতুষ্টয় উদ্ধার করেন। নৃসিংহ অবতারে, হিরণ্যকশিপুবধ। দুর্দ্দান্ত, দেবদ্বেষী, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু "কৃষ্ণ নামে" কলঙ্কার্পণ এবং ধর্ম্মদ্বেষ করিয়া সৃষ্টি কার্য্যের বিঘ্ন-সম্পাদন করিলে, নৃসিংহমূর্ত্তি, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। বামনাবতারে হরি, বলীকে ছলনা এবং ত্রিপদে ভূমি ভিক্ষা করিয়া, দেবগণকে ও বলীকে পরিত্রাণ করেন। ভগবান, পরশুরামমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একবিংশতিবার যুদ্ধে ধরাকে নিঃক্ষত্র করেন। রামাবতারে, লঙ্কাধিপতি দুর্দ্দান্ত দশস্কন্ধের নিধন সাধন করিয়া দেবতা ও নরগণের রক্ষা সাধন করেন। ভগবান হরি, কৃষ্ণাবতারে কুরুবংশ ধ্বংস করিয়া ধার্ম্মিক পাণ্ডব-

গণকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় সাধন করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধ—তর্কদ্বারা অন্য ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া স্বীয়ধর্ম্ম, প্রচার করিয়াছিলেন। আর কল্কি অবতার হইয়া কি কি কার্য্য করিবেন, তাঁহার লীলা কি হইবে, তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। কল্কিসম্বন্ধে পাঠকগণের যাঁহার যে বিশ্বাস থাকে থাকুক, আমরা সে বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে চাহি না।

অবতারগণের কার্য্য—যথা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এক্ষণে দশ মহাবিদ্যার কার্য্য ও মূর্ত্তি বর্ণনা এবং যথাসাধ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদ্বারা, দশ অবতার ও দশ মহাবিদ্যার একত্র সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিব। দশ মহাবিদ্যার ও দশ অবতারের কার্য্যাদির সম্যক্ আলোচনা ও আন্দোলন, বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। পুস্তকান্তরে ইহার আলোচনার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

দশমহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। এই দশমহাবিদ্যার সম্যক্ আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মহাবিদ্যার প্রত্যেকটী প্রকৃতির এক একটী মূর্ত্তি মাত্র। দশ মহাবিদ্যা পর্য্যালোচনা করিলে, অনন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া,মন বিমল শান্তিসুখ উপভোগ করিয়া থাকে। এ শিক্ষার উপদেষ্টা কে? এমন মনোহর কল্পনা—কোন মহাত্মার মস্তিষ্ক প্রসূত—তাহা কে জানে? তবে তিনি, যিনিই হউন—তাঁহার চরণে আমরা ভক্তিভাবে কোটী কোটী নমস্কার করি।

দশ মহাবিদ্যার প্রথম মূর্ত্তি—কালী। এই কালীর বিবরণ যথাসাধ্য বিবৃত হইতেছে।

কালী।

বিষম দুর্দ্দিন! পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল করবাশি, হিন্দুগণের পবিত্র বাসভূমিকে ঘোর অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া বহুদিন প্রস্থান করিয়াছে। এক দুই করিয়া তাঁহার কলাসমূহও জগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। বিষম দুর্দ্দিনে, সেই তমসাচ্ছন্ন নিবিড়ান্ধকার অমাবস্যার অমানিশা সহ, হিন্দুগণের ভাগ্যাকাশ, প্রলয়োপম তমোজালে জড়িত করিয়া তুলিল। কি ভয়ানক অন্ধকার! টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছে! মসীকৃষ্ণঘনক্রোড় বিদীর্ণ করিয়া, তাহার হৃদয় অগ্নিময় করিয়া মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্বিকাশ হইতেছে। জগত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। অন্ধকারের পর অন্ধকার, তাহার পর আরও ঘোর অন্ধকার, জগতকে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে, অন্ধকার যোট বাঁধিয়া যেন জগতকে তাহাদিগের সহিত মিলাইতে আসিতেছে। কি ভয়ানক সময়! সময়ের সেই ভয়াবহ ঘটনাস্রোত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, হিন্দুর পবিত্র হৃদয়, রাহুগ্রস্থ শশাঙ্ক সদৃশ ভয়কম্পিত হইল। এই বিষম দুর্দ্দিন দর্শনে, এই প্রলয়ঙ্করী দিবান্ধতমসা দর্শনে অমল পূর্ণচন্দ্রকরবিধৌত হিন্দুহৃদয় যে আতঙ্কে কম্পিত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

অন্ধকারপ্রার্থী, অমাসহচর দৈত্য দানব, হিন্দুদিগের বিষম অনিষ্ট সংসাধন করিতে লাগিল। তাহাদের জীমূতভৈরব হুহুঙ্কারে হিন্দুহৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। ধর্ম্মজ্ঞানহীন, বীভৎস্যমূর্ত্তি, জঘন্য-ইন্দ্রিয়প্রতিম দৈত্যগণ, ধর্ম্মার্থীগণের ধর্ম্মবিঘ্ন ঘটাইতে লাগিল, তাঁহাদিগকে কুকর্ম্মের সোপানহীন

কূপে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপের সম্ভাবনা হইল, আর কি হিন্দু স্থির থাকিতে পারে? ধর্ম্মহীন হইয়া হিন্দু কি জীবিত থাকিতে পারে? ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমনিষীগণ, ভয়-বিকম্পিত দেহে, ভক্তিভরে "মা, মা" বলিয়া মহাশক্তির আরাধনা আরম্ভ করিলেন। মহাশক্তির মহাশক্তি প্রার্থনা করিলেন। ভীতিজড়িতকণ্ঠে, ভক্তগণ শক্তিস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। করুণস্বরে তাঁহাকে আবাহন করিতে লাগিলেন, ভক্তের সম্বোধন কখন কি বিফল হয়? চরণাশ্রিত ধর্ম্মপরায়ণ শক্তিসেবকের আবাহন তিনি কি অবহেলা করিতে পারেন? ভক্তের সুখবর্দ্ধন হেতুই যখন তাঁহার লীলা, তখন তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? সেই ধর্ম্মলোপসমাবদ্ধ তমোগর্ভ রজনীতে, মহাশক্তি, মহাশক্তি রূপে অবতীর্ণা হইলেন। শক্তি, পাপাচারী দৈত্যদলসংহার মানসে ভয়ঙ্করী ভীমারূপে অবতীর্ণা হইলেন, তাহাতে দৈত্যহৃদয় কম্পিত হইল, ভক্তহৃদয় ভক্তি ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। স্বর্গীয় মহাশক্তি, অনন্ত বলবাশিযুক্ত ঐশীশক্তির ভীম সংঘর্ষণে, পার্থিব দৈত্যবীর্য্য বিদ্ধস্ত ও চূর্ণ বিচূর্ণিত হইয়া গেল। যে মূর্ত্তিমান কামরূপী দৈত্য, শক্তির শক্তিত্ব নাশে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, আজি সেই অহঙ্কৃত পিশাচ পরাজিত; ত্রিশক্তি মহাশক্তির নিকট, দৈত্যশক্তি আজ অকৃতকার্য্য; দৈত্যশক্তিবিমর্দ্দিনী ভক্তগণকে অভয়দান করিলেন। যেরূপে কালী দৈত্যনাশার্থে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, সেরূপ, সেই রূপেরই উপযুক্ত।

কালী—কালীর হস্তচতুষ্টয়ের এক হস্তে প্রচণ্ড খাণ্ডা, পাপাধম অধার্ম্মিকগণের ভীতিবিধান করিতেছে, অপর হস্তে, ধর্ম্ম-

নিরত সাধুগণকে ইঙ্গিতে অভয়দান করিতেছে, এক হস্তে সদ্যচ্ছিন্ন দৈত্যমুণ্ড দরদরিত ধারে শোণিত স্রাব করিতেছে, চতুর্থ হস্তে শান্তিপ্রিয়ার শান্তিসূচক কমল শোভা সম্পাদন করিতেছে। লোলজিহ্বা পাপিহৃদয়স্থ উষ্ণ শোণিত পানার্থে লক্ লক্ করিতেছে; পদতলে, মহাদেব পতিত রহিয়াছেন। শক্তি শিবের বক্ষোপরে আরূঢ়া। এ শক্তি, ঈশহৃদয়বাসিনী ঈশানী। শক্তি সচ্চিদানন্দের হৃদয় উদ্ভূতা, হৃদয়েই বিরাজিতা, তাই শক্তি, স্বামীর হৃদয়ে। কালী রণরঙ্গে উলাঙ্গিনী! কি মধুময় চিত্র! কি উপদেশময় তাৎপর্য্য! শান্তি-বিগ্রহ একই স্থলে! হিন্দু! শক্তিসেবক! এমন মধুময় কল্পনা, এমন অলৌকিক ভাব পরম্পরা আর কোথায় পাইবে? কালী শক্তি; সেই শক্তি সেই ঐশী শক্তি ভিন্ন দুর্দ্দম্য অসুরাদি বিনাশের সম্ভাবনা কোথায়? আমাদিগের দেহমধ্যস্থরিপুস্বরূপ অসুব দলকে ঐশিকী শক্তি ভিন্ন, অন্যের কি সাধ্য দমিত রাখিবে? অসুর জগতের অনিষ্টকারী, অসুর ধর্ম্ম বিনাশকারী; রিপু অসুরও, দেহজগতের অনিষ্টকারী ধর্ম্মনাশকারী, দেহজগতস্থ রিপু-অসুর দমনার্থেই কালী পূজা। শক্তিসাধক শক্তি সাধনা করেন, শক্তি লাভার্থ। অসুর ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাইত, তোমার দেহস্থ ধর্ম্মার্জ্জনীসদ্‌বৃত্তি সমূহ, রিপুর প্রবলতাড়নে পরিস্ফূট হইতে পাইতেছেনা, পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সৎকার্য্যের অনুশীলন করিতে পারিতেছে না, অতএব শক্তি পূজা করিয়া, হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় কর, শক্তি প্রভাবে, তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইবে। উপযুক্ত ঐশ্বরীক শক্তি ভিন্ন, অমিতবলশালী অসুর বিনাশ হইবে না, রিপু জয় হইবে না। তাই বলি শক্তি সাধনা

অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দু! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ, যে ঘোর দুর্দ্দিনে পতিত হইয়া শক্তিসাধনা করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসি! আজ তোমাদিগের তাদৃশ দুর্দ্দিন সমুপস্থিত! আমরাও তাদৃশ অন্ধকারে পতিত, আইস ভাই! আমরা মহাশক্তির পূজা করি, অরাজকনাশিনী, পাপিদণ্ডবিধাত্রী কালীকাদেবীর আরাধনা করি। আমরাও ত হিন্দু! আমাদিগের ধমনীতেও ত আর্য্যশোণিত মৃদুমন্দ প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে, আমরাও ত শক্তি সাধক শক্তি সন্তান, তবে মহাশক্তি প্রার্থনায় কেন বিরত রহিয়াছি? 'ভক্তহৃদয়বাসিনি! তুমিও ত মা তোমার সন্তান হৃদয় দেখিতেছ, তুমিত মা ইচ্ছাময়ী, তুমিত মা ইচ্ছা করিলে সন্তানের হৃদয়বহ্নি নির্ব্বাণ করিতে পার, বিধর্ম্মীর অনুশাসনে অযথা শাসিত, বৈষম্যের প্রবল তাড়নে চূর্ণ বিচূর্ণিত, বিজেতার অবিমৃশ্যকারিতায় একদেশদর্শিতায় মর্ম্মপীড়িত, প্রবলের অত্যাচার ছুরিকায় ক্ষত বিক্ষত, পাপ-হৃদয় পুড়িয়া যে ছাই হইল মা? শক্তিদায়িনি! শক্তি-দানে হীনবল সন্তানবৃন্দকে কি বলীয়ান করিব না? মা অভয়ে! ভয় বিকম্পিত শরীরে, নিজের মানসিক সামান্য শক্তিটুকুও গোপন করিয়া আর কতদিন থাকিব মা! ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনি, অমিতশক্তিশালিনি চিন্ময়ি! জাগ মা, এই ভগ্ন বঙ্গবাসীহৃদয়ে একবার জাগ মা, ভাই বঙ্গবাসি! আইস, একবার সকলে মিলিয়া, ব্রাহ্মণ—শূদ্র বৈষম্য ভুলিয়া, এক সূত্রে বদ্ধ হইয়া, এক শক্তিমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া, আমরা শক্তি সাধনা করি। শক্তি প্রার্থি! বল ভাই একবার সমস্বরে;—

সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।

শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে॥

তারা।

কাল রাত্রি দিনেপ্রাপ্তা নিশায়াং মধ্যভাগকে।
উগ্রাপত্তারণার্থস্তু উগ্রতারা স্বয়ং কলা॥
মেরোঃ পশ্চিম কুলেতু চোলখ্যোঽস্তি হ্রদোমহান্।
তত্রযজ্ঞে স্বয়ং দেবী মাতা নীলস্বরস্বতী॥

শুম্ভনিশুম্ভ নামধেয় অসুরদ্বয়ের আপদ হইতে দেবতা-কুলকে নিরাপদ করিবার জন্য, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্তৃক আহুত হইয়া মেরুপর্ব্বতের পশ্চিমোপকুলে চোলখ্য নাম-ধেয় মহাহ্রদকুলে মাতা নীলসরস্বতী অবিভূর্তা হন। তিনি উগ্রাপত্তারণার্থ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি উগ্রতারা নামেও কথিতা হইয়া থাকেন। উৎপত্তি কালে তিনি শ্বেতবর্ণা* ছিলেন, তৎপরে শিবের ঊর্দ্ধবদন বিনিঃসৃত তেজঃপ্রভাবে তিনি নীলবর্ণ ধারণ করেন

তারা সাক্ষাৎ তারকব্রহ্মরূপিণী, এজন্য তিনি তারা নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। আকাশ যদ্রূপ নীলবর্ণ এবং অনন্ত, তদ্রূপ ইঁহার শরীর অতি স্বচ্ছ নীলবর্ণ—অনন্ত ব্যাপক। হস্ত চতুষ্টয়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ স্বরূপ। ইনি লম্বো-দরা, অথচ খর্ব্বাকারা। তাৎপর্য্য এই যে, ইনি ব্রহ্মাণ্ডো-

---

* তপস্তাং চরতং তস্মিন্ ত্রিযুগং সমবর্ত্তত॥
মনোর্দ্ধ্বি বাক্ নিঃসৃত্য তেজোরাশি বিবর্দ্ধিতঃ।
হ্রদজলে নিপত্যেব নীলবর্ণাভবত্তদা॥

দরী। এই বিশাল গ্রহনক্ষত্রসম্বলিত মহান জগত, তাঁহার উদরে, এজন্য তিনি লম্বোদরা; আবার জগতকে উদরে ধারণ করিয়াও তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে, তিনি জগতের অতীতা হইয়াও জগতের অন্তর্নিবিষ্টা, এজন্য তিনি খর্ব্বাকৃতি। ব্যাঘ্রাজিন—ইহাঁর পরিধানে। ব্যাঘ্রাজিন—ধর্ম্মবাস। ইনি সেই ধর্ম্মবাস পরিধান করিয়া বস্ত্র পরিধানের মূলকারণ-স্বরূপ লজ্জা নিবারণ করিতেছেন। মুণ্ডমালা—দেবীর হস্তে শোভমানা। মুণ্ডমালা অসংখ্য পাপাসক্ত জনগণ স্বরূপ। মুণ্ডই দেহের শ্রেষ্ঠাংশ, এজন্য মুণ্ডই—পাপীগণের স্বরূপ। দেবী, জ্ঞানাস্ত্রে পাপী সমূহের স্কন্ধ দেহচ্যুত করিয়া বাম হস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, পরন্তু তারা মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক ভাব, সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মের প্রণবস্বরূপ।

ষোড়শী।

"কৈলাশশিখরে রম্যে বসমানে চ শঙ্করে।
ইন্দ্রশ্চ প্রেসয়ামাস সর্ব্বশ্চাপ্সরসো মুদা॥
আগতাস্ত মহাদেবং তুষ্টবুস্তং মহেশ্বরং॥"

একদা ভগবান শঙ্কর, কৈলাশশিখরে রম্যাসনে আসীন আছেন, এমন সময়ে তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থ, ইন্দ্র-প্রেরিত অপ্সরাগণ, তৎসম্মুখে সমাগতা হইয়া যথাবিধি স্তব করিতে লাগিল। শিব অপ্সরাগণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া প্রেমভাবে তাঁহাদিকে বিলোকন এবং কারুণ্যপূর্ণ বচনে কহিলেন,—পুরুষের আতিথ্য পুরুষের দ্বারা এবং স্ত্রীর আতিথ্য স্ত্রীলোকদ্বারা নিষ্পন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য। অতএব তোমরা কালিকার নিকট

গমন কর। তিনিই তোমাদের যথাবিধি আতিথ্য সৎকার করিবেন।*

মহাদেব পুনঃপুনঃ "কালী—কালী" বলিয়া আবাহন করায়, কালিকা কিঞ্চিৎ অভিমানিনী হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, আমি এই কালীরূপ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ গৌরীমূর্ত্তি ধারণ করিব। † সেই ইচ্ছা হইতেই ষোড়শী আবির্ভূতা হইলেন। ষোড়শী পূর্ণযৌবনা—তাই তাঁহার কার্য্যে যৌবনের একটু অভিমান বর্ত্তমান। যৌবনে—বিলাসিতার অধিকার। বিলাসিতা, যুবক যুবতীর চক্ষে প্রতিক্ষণে নিজ মনমোহিনী মূর্ত্তি চিত্রিত করে। পতির কোন বাক্যে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে. হৃদয়ে বিজাতীয় অভিমানের তরঙ্গ উঠিতে থাকে। মহাদেব "কালী কালী" অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গী বলায়, তাঁহার দারুণ অভিমান হইল এবং সেইজন্যই তিনি শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক গৌরীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে একবার কালী মূর্ত্তিতে দেখিলেন। আবার একবার শুদ্ধ গৌরী-মূর্ত্তিতে দেখিলেন; তিনি কৃষ্ণাঙ্গী হইয়াও গৌরী।

গৌরী মনোহরবেশে শঙ্করসকাশে সমুপস্থিত হইলে, তিনি কহিলেন "শিবে! তুমি ত্রিভুবনে আপনার শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলে। একারণ স্বর্গ, মর্ত্ত, এবং পাতালাদি সর্ব্বলোকে তোমাকে সুন্দরী, পঞ্চমী. শ্রী, বিদ্যা এবং ত্রিপুরসুন্দরী নামে

* পুরুষস্যাতিথির্জ্ঞেয়ঃ পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।,
স্ত্রীণাং স্ত্রীচাতিথির্জ্ঞেয়া তস্মাদ্‌গচ্ছত কালিকাং
† ততো দেবী মহাকালী চিন্তয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।
এতদ্রূপ মপাকৃত্য শুদ্ধগৌরী ভবাম্যহম্।

অভিহিত করিবে। তুমি সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়াহেতু, লোকে তোমাকে ষোড়শী বলিয়া আখ্যাত করিবে। হে সুরেশ্বরি! তুমি আমাতে তোমার ছায়া সন্দর্শন করিয়া যেমন ভীত হইলে, ত্রিলোকে তুমি ত্রিপুরভৈরবী বলিয়াও আখ্যাত হইবে।

ত্রিপুরভৈরবী শব্দে কি বুঝায়, দেখা যাউক। ত্রিপুর শব্দে জীব। যেমন ভূঃ—ভূলোক, ভূব—ভব লোক এবং স্ব অর্থাৎ স্বর্লোক, এই তিনটীকে ত্রিপুর বলে। অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্ত এবং পাতাল। জীবদেহে এই ত্রিপুর অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতাললোক বর্ত্তমান আছে। পাদদেশের মূল হইতে কোটী দেশ পর্য্যন্ত পাতাললোক, কোটীদেশ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত মর্ত্তলোক এবং কণ্ঠদেশ হইতে মস্তকব্যাপী স্বর্গলোক। এই পুরত্রয় পরিমিত জীব—ত্রিপুর নামে অভিহিত হয়। এই ত্রিপুরের যিনি ভৈরবী, তিনিই ত্রিপুরভৈরবী। ভৈরব—অর্থে, যিনি ভীরুদিগকে রক্ষা করেন, যিনি ভিরুগণের ঈশ্বর তিনিই ভৈরব—সেই ভৈরবের প্রকৃতি ভৈরবী। ভীত জীবগণের যিনি ভয় নিরাকরণ করেন, তিনিই ভৈরবী। যাহারা ভয়ের আশ্রিত তাহারাই ভিরু। ভয় কি? কোন ভয় গরিষ্ঠ? জগতে যত প্রকার ভয় আছে, জীবের

---

* যস্মাৎ ত্রিভুবনে রূপং শ্রেষ্ঠং কৃতবতী শিবে।
তস্মাৎ স্বর্গেচ মর্ত্ত্যেচ পাতালেহত্র পার্ব্বতি ॥
সুন্দরী পঞ্চমী শ্রীশ্চখ্যাতা ত্রিপুরসুন্দরী।
সদা ষোড়শবর্ষীয়া বিখ্যাতা ষোড়শী ততঃ ॥
যৎ ছায়াং হৃদয়ে মেহদ্য দৃষ্ট্বা ভীতাহ সুরেশ্বরী।
তস্মাৎ ত্বং ত্রিষু লোকেষু খ্যাতা ত্রিপুরভৈরবী ॥

মৃত্যু ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা গরিষ্ঠ। জীবগণকে যিনি মৃত্যুভয় হইতে রক্ষা করেন, যাঁহার পদে মনপ্রাণ সমর্পণ করিলে শমনভয় নিবারিত হয়; তিনিই ত্রিপুরভৈরবী। ত্রিপুরভৈরবী পরম ব্রহ্মের জীবপবিত্রাণকারী অংশ মুর্ত্তি।

ভুবনেশ্বরী।

ষোড়শীবিদ্যাই, সুন্দরী, ভুবনেশ্বরী ও রাজরাজেশ্বরী নামে অভিহিতা। ষট্‌চক্রব্যাখ্যায়, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূত; চন্দ্র, মণিপুর, অনাহত, স্বাধিষ্ঠান, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাপুর এই ছয়টী ষট্‌চক্রে অবস্থাপিত রহিয়াছে। মূলে—লং, লিঙ্গে—বং, নাড়ীতে—রং, হৃদয়ে—যং, কণ্ঠে—হং, ভ্রূমধ্যে— ঠং বীজ প্রণবরূপে বর্ত্তমান। ভ্রূমধ্যে নাদবিন্দু ও তাহাতে প্রণবরূপ শিব বর্ত্তমান।

"বিন্দুরূপঃ শিবঃ সাক্ষাৎ নাদশক্তি সমন্বিতঃ।"

নাদচক্রে সূর্য্য ও বিন্দুচক্রে চন্দ্র বর্ত্তমান। সূর্য্য রক্তবর্ণ রক্তাত্মক, সোম শ্বেতবর্ণ শুক্রাত্মক। এই হেতু পরমপুরুষ শিব শুক্লবর্ণ, তিনি বীজরূপী। আর রক্তবর্ণ পরমপ্রকৃতি—ভুবনেশ্বরী। সন্তান সমুৎপাদনার্থ পুরুষের বীর্য্য ও স্ত্রীর শোণিতের প্রয়োজন। যদ্রূপ পুরুষের বীর্য্য, স্ত্রীর শোণিত দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সন্তান সমুৎপাদিত করে; তদ্রূপ পুরুষ ও প্রকৃতির তাদৃশ সম্মীলনে সংসারে জীবশ্রেণী সৃজিত হইয়া থাকে। পুরুষ, প্রকৃতির সম্মিলনে সৃষ্টিকার্য্য সাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি যখন প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত, তখন তিনি নির্গুণ, কার্য্যাকার্য্য শূন্য; আর যখন তিনি প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত, তখন

তিনি গুণসম্পন্ন এবং সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত। এই তত্ত্ব উপদেশ দিবার জন্য, ভুবনেশ্বরীর রক্তবর্ণ এবং শিবের শ্বেতবর্ণ ধারণের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরী—ব্রহ্মের বিশ্বসৃষ্টিকরী অংশ-মূর্ত্তি। তিনি সৃষ্টিকারিণী।'

ভৈরবী।

ভৈরবীর বিস্তৃতবিবরণ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। "ষোড়শী" শীর্ষক প্রবন্ধে ত্রিপুরেশ্বরীর, বিবরণ উৎপত্তি ও অর্থ, দর্শন করিলেই ভৈরবীর যাবতীয় বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে, সুতরাং তাহা এস্থলে পুনরুল্লেখ বাহুল্য। ভৈরবী শব্দের তাৎপর্য্য বিশেষ প্রকারে দ্রষ্টব্য।

ছিন্নমস্তা।

"পুরকৃতযুগে চৈব কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে।
মহামায়া ময়াসার্দ্ধং মহারতপরায়ণা॥
শুক্রোৎসারণকালে চ চণ্ডমূর্ত্তিরভূত্তদা।
তস্যাঃ স্বদেহ সম্ভূতে দ্বেশক্তী সম্বভূবতুঃ॥
ডাকিনী বর্ণিনী নাম্না সখৌ তাভ্যাং সহস্থিকা।
পুষ্পভদ্রা নদীকূলং জগাম চণ্ডনায়িকা॥
মধ্যাহ্নে চ ক্ষুধার্ত্তে তে চণ্ডিকাং পৃচ্ছতস্ততঃ॥
ভক্ষণং দেহি তৎ শ্রুত্বা বিহস্য চণ্ডিকা শুভা।
চিচ্ছেদ নিজমূর্দ্ধানং নিরীক্ষ্য সকলাং দিশং॥

পূর্ব্বকালে সত্যযুগে পর্ব্বতোত্তম কৈলাশে, মহামায়া আমার

সহিত রতিক্রীড়াপরায়ণ হইয়াছিলেন। সেই রতিক্রীড়ায় শুক্রোৎসারণ সময়ে তাঁহার শরীর হইতে দুইটী শক্তি উৎপন্না হয়েন। একের নাম ডাকিনী, অপরের নাম বর্ণিনী। এই উভয় সখীর সহিত ঐ প্রচণ্ডমূর্ত্তি জগতপ্রসূ চণ্ডনায়িকা পুষ্পভদ্রা নদীতে স্নান করণার্থ গমন করিলেন। অনন্তর মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত হইলে, সখীদ্বয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চণ্ডিকাকে কহিল, মাতঃ! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি, কিঞ্চিৎ আহার্য্য প্রদান করুন। সখীদ্বয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী ঈষদ্ধাস্য করতঃ দশদিকে অবলোকন করিয়া (নখাগ্রে) আপন মস্তক ছেদন করিলেন।

ছেদনমাত্র ঐ ছিন্নমস্তক দেবীর বাম হস্তে নিপতিত হইল, এবং কণ্ঠ হইতে ধারাত্রয়ে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।

ধারাত্রয়ের বামধারা ডাকিনী, দক্ষিণধারা বর্ণিনী এবং মধ্যধারা আপনি স্বয়ং পান করিলেন। এই শোণিতস্রাব সম্বন্ধে একটী গুঢ় রহস্য আছে। শোণিত ধারা যথাক্রমে ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার রূপক মাত্র। ঈড়া—ডাকিনী, পিঙ্গলা—বর্ণিনী এবং সুষুম্না স্বয়ং ভগবতী। সুষুম্না নাড়ীপ্রধানা। ঈড়া, পিঙ্গলা, তাহার প্রতিপোষক মাত্র। তাই দেবী স্বয়ং সুষুম্না রূপিণী। জীব হৃদয়ে তিনি সুষুম্নারূপে অবস্থিতা।

ছিন্নমস্তা অযথারতিক্রীড়ার বিষময়ফলের একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ডাকিনী—কামপ্রবৃত্তি, বর্ণিনী—প্ররোচনা। রমণী, বর্ণিনী কর্ত্তৃক উত্তেজিত ও কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া স্বীয় শরীরস্থ, স্বীয় শোণিত স্বয়ং পান করে। কাম প্রবৃত্তির সঙ্গিনী—প্ররোচনা, কামপ্রবৃত্তি ও প্ররোচনা উভয়ে একত্রিত

ও একমতাবলম্বী হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে। মানব যে দুষ্ক্রিয়াসক্ত হয়, সে কেবল ইহাদিগেরই উত্তেজনা হেতু। রজঃস্বলার দিনত্রয় জীবকোষ প্রস্ফুটিত হইয়া ঈড়া পিঙ্গলাদি ত্রিধারায় শোণিত নির্গত হয়। যে উক্ত তিন দিনে রতিক্রীয়াসক্ত হয়, সে নিজের শোণিত নিজে পান করে। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন—একটু রুচিবিরুদ্ধ ঘটনায় অবতারণা না করিলে কথাটা ভাল করিয়া বুঝান হইবে না। রজঃস্বলা হইলে জীবকোষ হইতে ত্রিধারায় শোণিত স্রাব হয় এবং তজ্জন্য জীবকোষ এতাদৃশ পীড়িত থাকে, যে, তাহার বীর্য্য ধারণের বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা থাকেনা, অত্যল্পমাত্র বেগেই জীবকোষ ছিন্ন হইয়া যায়। জীবকোষ ছিন্ন হইলে বীর্য্য ধারণে তাহার আর ক্ষমতা থাকে না। যে নারী উক্ত দিবসত্রয় রতিক্রিয়াসক্তা হন, তিনি সন্তানলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, অতএব যিনি স্বেচ্ছায় তুচ্ছকামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া সন্তানজননের পথরুদ্ধ করিতে পারেন, তিনি যে নিজের শোণিত নিজে পান করেন, নিজের আত্মা নিজে বিনাশ করেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ছিন্নমস্তা রক্তবর্ণা, রক্ত সদৃশ তাঁহার বর্ণহেতু পুর্ব্বোক্ত বাক্য আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

ধূমাবতী।

ধূম্রশব্দে তমঃ। তমঃ সকলকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে যিনি শুদ্ধ স্বচ্ছ হইয়াও সংসারহিতার্থ ধূম্রবর্ণ ধারণ করেন তিনিই ধূমাবতী। ধূমশব্দে মেঘ। মেঘ অনন্ত—অতএব যিনি অনন্ত স্বরূপিণী—তিনিই ধূমাবতী। যিনি জীবকে ধারণ

ও আচ্ছাদন করিয়া আছেন, ব্রহ্মের সেই আভ্যন্তরিক মূর্ত্তিই ধূমাবতী। ইনি কখনও ষোড়শী আকার, কখন বৃদ্ধাবিধবা। প্রকৃতিরূপিণী মহাবিদ্যাগণের নানা মূর্ত্তি। তাঁহারা সৃষ্টিরক্ষার্থে নানা বেশে নানা স্থানে বিরাজমানা।

বগলা।

বগ—শব্দে জড়। ল—শব্দে চৈতন্য। আকারের অর্থ কর্ত্রী। যিনি জড়ের চৈতন্যদাত্রী এবং জগতের কর্ত্রী তিনিই বগলা। জড়ই জগতের প্রাণ। জড়পদার্থের আবর্ত্তনে সংসারের তাবত কার্য্যই সমাহিত হইতেছে। জড় চৈতন্য প্রাপ্ত হয়—ক্ষণকালের জন্য; জড়ভাবাপন্ন থাকে—অনন্তকাল। জড়পদার্থ চৈতন্যময় হইয়া সংসারে জড়ের প্রতি আধিপত্য করে; আবার চৈতন্য বিলুপ্ত করিয়া স্বকীয় জড়দেহ জড়ের সহিত মিশ্রিত করে। যিনি জড়ের চৈতন্য দান করেন, যিনি অসার জড় পদার্থকে চৈতন্য দান করিয়া সৃষ্টি কার্য্য সাধন করেন এবং কার্য্যশেষে চৈতন্য সংহরণ করিয়া জড়ের জড়ত্বভাব সাধন করেন, সেই জড়ের চৈতন্যদাত্রী মহাবিদ্যার নামই বগলা। বগলা চিন্ময়ী প্রকৃতির চৈতন্যময় সৃষ্টিকারি অংশমূর্ত্তি।

মাতঙ্গী।

মত—অভিমত। গ অর্থে গমন। ঈকার অর্থে গ্রহণ। যিনি ভক্তগণকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, যিনি ইচ্ছাময়ী এবং সর্ব্বত্র গামিনী, তিনিই—মাতঙ্গী। যাহারা ধর্ম্মনিন্দুক, যাহাদিগের পাপজিহ্বা অধর্ম্মকাহিনী রটনা করে, দেবী, সেই পাপাত্মাগণের রসনা সমাকর্ষণ পূর্ব্বক মুদ্গরাঘাত করিতেছেন।

রসনা পাপার্জ্জনের প্রধান অবলম্বন। রসনাই পাপের প্রশ্রয় দান করে, রসনা যেরূপ উক্তির অবতারণা করে, জীব জীবনে তদনুরূপ ফলভোগ করে।—সেইজন্য দেবী পাপীর রসনা সমাকর্ষণ পূর্ব্বক মুদ্গরাঘাত করিতেছেন। রসনাকে শাসন করা, রসনাকে আপন ইচ্ছানুবর্ত্তিনী করা, মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। মনে যে কু-অভিসন্ধি, পাপ-চিন্তা উদিত হয়, রসনা তাহা রটনা করে, সেই জন্য রসনাকে স্ববশে আনয়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কমলা।

ক অর্থে ব্রহ্মা। ম অর্থে শিব, লা অর্থে দান। যাঁহার কৃপায় জীব ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, তিনিই কমলা। পরব্রহ্ম বিশ্বরূপ, তিনি কখন বালক কখন বালিকা, কখন যুবক, কখন যুবতী, আবার কখন বৃদ্ধ কখন বৃদ্ধা। তাঁহার অনন্তরূপ অনন্ত জগতে দেদিপ্যমান।

পুমাংস্ত্বং স্ত্রীত্বং উতস্ত্বং বালোযুবা।
বৃদ্ধস্ত্বং দণ্ডোদণ্ডেন জীর্য্যতে॥

শ্রুতিঃ।

যাঁহার আরাধনায় জীবের ঐহিক মঙ্গল ও পরলৌকিক মঙ্গল সাধিত হয়, যাঁহার কৃপায় জীব, ইন্দ্রত্বকেও তুচ্ছ করিয়া, অত্যুচ্চ শিবত্ব আর ব্রহ্মত্ব লাভেই সমর্থ হইয়া থাকে, বিশ্বময় হরির সেইরূপই—কমলা। কমলা, মাতৃকাবেশে জীবসকাশে সমুপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগের মঙ্গলবিধান করিতেছেন। হরির

যে অংশের নাম দয়াময়, সেই অংশই 'কমলা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দয়ার প্রকৃতি গুণবতী রমণীর ন্যায়, তাহাতে পুরুষের পরুষভাব নাই, পুরুষের হৃদয়ের ন্যায় তাহাতে সন্দেহ, শঙ্কা নাই, দয়া নিয়তই দয়াময়ী। কৃপাভিখারি সন্তানে দয়াবিতরণে দয়াময়ীর কুণ্ঠা নাই, শঙ্কা নাই, বা সন্দেহ নাই। করুণাময়ী কমলা অবিচলিত চিত্তে সন্তানের প্রতি চিরদিন করুণাবারি সিঞ্চন করিতেছেন। তাঁহার পবিত্র কারুণ্যস্রোত সহস্রধারে প্রবাহিত হইয়া জীবজীবনের শান্তিরক্ষা করিতেছে।

দশ মহাবিদ্যার রূপ ও কার্য্যাদি আলোচনা দ্বারা যথাসাধ্য প্রতিপন্ন হইল যে, দশ মহাবিদ্যা ও দশাবতার সেই পরম ব্রহ্মের রূপকমাত্র। সকলই সেই বিশ্বময়ের লীলা।

"কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ বরাহশ্চৈব তারিণী।
সুন্দরী যামদগ্ন্যস্তু বামনো ভুবনেশ্বরী॥
ছিন্নমস্তা নৃসিংহস্তু বলভদ্রস্তু ভৈরবী।
কমঠো বগলাদেবী মীনো ধুমাবতীস্তথা॥
বুদ্ধোজ্ঞেয়াহি মাতঙ্গী কল্কিস্তু কমলাত্মিকা।
এতে দশাবতারাস্তু দশবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

এই দশ অবতার ও দশ মহাবিদ্যার ইত্যাকার সামঞ্জস্য আছে। প্রত্যেক অবতারের সহিত প্রত্যেক মহাবিদ্যার সামঞ্জস্য করিতে গেলে, হরিসাধনে স্থান কুলাইবেনা। অপিচ, মহাবিদ্যা সম্বন্ধেও যাহা বলা হইল তাহা অতীব সামান্য। সেই পবিত্র রহস্যময় চরিত্রের দুই একটী মাত্র বর্ণনে হৃদয়ের তৃপ্তি

হয় না। পাঠকগণ, ইচ্ছা করিলে পৃথক্ গ্রন্থে ইহার ভাবত বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

যাঁহাদিগের পবিত্রহৃদয় হইতে এই সমস্ত অমূল্যতত্ত্ব নিঃসৃত হইয়াছে, যাঁহাদিগের কৃপায় এই অনন্তশিক্ষাপ্রদ চরিত্র মালা আমরা নেত্রগোচর করিতে পাইতেছি, সেই অসামান্য কাল্পনিক গণের চরণে আমরা ভক্তিভাবে প্রণত হইতেছি। কাল্পনিক অনেক আছেন, স্বকপোল কল্পিত ঘটনাবলী অনেকে সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু সত্যকে এমন করিয়া রহস্য মণ্ডিত—এমন ভাবে রূপকজালাবৃত কেহ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা মনে করেন, এ রহস্য সামান্য কবিকল্পনা মাত্র, তাঁহারা বিবেচনা করেন ইহা অসার মস্তিষ্কের অসার আন্দোলন মাত্র, তাহাদিগের জন্য আমরা নিতান্তই দুঃখিত; তাঁহাদিগের সুমতির জন্য আমরা হরির সমীপে প্রার্থনা নিরন্তর করি।

যিনি সর্ব্ব সামঞ্জস্যকারী যাবং সামঞ্জস্যই সেই বিশ্বময় হরির সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ। এ কথা ক্রমশঃ আরও স্পষ্টীকৃত হইবে।

পঞ্চম ভাব।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা যথাসাধ্য আলোচনা করা যাইতেছে। মহাভারতে যদিও ইহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না, তথাপি অন্যান্য গ্রন্থাদিতে তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যাহা আধুনিকগণের কৃষ্ণ বিদ্বেষের প্রতি কারণ সমুৎপাদন করিতেছে, সেই সমস্ত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা

নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে ; কেননা, যে সমস্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ মহাভারতে নাই, অথচ সাধরণ্যে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সে সমস্ত ঘটনা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিলে, সাধারণে তাহা বিশ্বাস করিবেন কেন ? পরন্তু তাঁহাদিগের মনে এসম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, হরি সাধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হইবে ; এই বিবেচনায় কৃষ্ণের বাল্য-লীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ কংশবধ বৃত্তান্ত। কংশরাজ ধর্ম্মরাজ নহেন—অধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি। গো হত্যা, ব্রহ্ম হত্যা ইত্যাদি যাহা সংসারের ঘোর অনিষ্টকর মহাপাতকজনক, সেই সমস্ত কার্য্যই কংশ রাজার চিরকরণীয়।

দেবদ্বিজ বিদ্বেষ, প্রাকৃতিক কার্য্যের বৈপরিত্যাচরণ, ন্যায়ের ব্যভিচার, এ সকল কংস হৃদয়ের প্রাণ স্বরূপ। তাহার রাজত্বকালে সংসার পাপের আকর হইয়া উঠিয়াছিল, ধার্ম্মিক সুমতিগণ পাপমতি নৃপতির ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত, বিতাড়িত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, অধর্ম্মের ভীমপদাঘাতে, ধর্ম্ম, সংকুচিত হইয়া ভীতমনে কংশরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ; রাজ্য ঘোর দুষ্ক্রিয়ার আশ্রয় স্বরূপ হওয়াতে অহরহঃ কেবল পাপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হইতে লাগিল, ধর্ম্মভয় না থাকিলে জীব হৃদয়ে যাদৃশ বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়, কংসরাজ্যবাসী জনসাধারণের হৃদয় তাদৃশভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল ; মূর্ত্তিমান অনর্থরূপধারী কংস, ইচ্ছানুসারে বিবিধ দুষ্কার্য্য সাধন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সাধুগণের পরিত্রাণ, ধর্ম্মের সংরক্ষণ, ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত জনগণের

বিনাশ সাধন জন্য শ্রীহরির "কৃষ্ণ" মূর্ত্তিতে আবির্ভাব। এই আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সাধন জন্য, ধরণীকে দুষ্কর্ম্মান্বিতগণের গুরু-ভার হইতে নিস্তার করিবার জন্য, সংসারে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য এবং ধর্ম্মের আশ্রয় স্বরূপ ধর্ম্মিকগণের রক্ষাবিধানের জন্য তিনি কংশের অস্তিত্বের বিলুপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। যে দুষ্কর্ম্মাসক্ত, যাহার হৃদয় ধর্ম্মভাবশূন্য—কেবল অধর্ম্মের পূর্ণ রাজত্ব, তাহার নিধন অবশ্যম্ভাবি। অধর্ম্ম মহাবলবান ও সহস্র জনের আশ্রয়স্থান হইলেও পরিণামে যে তাহাকে ধর্ম্মের চরণে শরণাগত হইতে হয়, ইহা প্রত্যক্ষ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ স্বহস্তে কংসের নিধন সাধন করিয়াছিলেন।

পুতনা বধ।—পুতনা, কংসের পরামর্শে প্রখর হলাহল যুগলস্তনে মর্দ্দন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যদান করিতে আসিল। অন্তর্য্যামী অন্তর জানিতে পারিয়া চপেটামাত্রে তাহার প্রাণান্ত করিলেন। দুগ্ধ—অমৃত;—অমৃতের পরিবর্ত্তে যে বিষদান করিতে পারে, অমৃতের ছলনে গরল দিয়া, যে, সরল শিশুকে হত্যা করিতে পারে, তাহার মত মহাপাতকপ্রাণ দ্বিতীয় আর নাই। সংসারে এরূপ জীবনের অস্তিত্ব মহা অনর্থের মূল। এই মহা নীতির সমর্থন জন্য, এই উপদেশবাক্য জগতে অক্ষয় রাখিবার জন্য রাক্ষসী পুতনার প্রাণ হনন হইল। পুতনা হত্যায়, রূপক ভেদে, আর একটী রহস্য যথা;—স্ত্রীলোকের গর্ভবতী অবস্থাতেই স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়, প্রসবের পূর্ব্বে গর্ভাবস্থায় এই স্তন্য বিষবৎ ত্যাজ্য। এ অবস্থায়, এই দুগ্ধ কোন শিশুকে পান করাইলে শিশুর ধাতুতে ঘোর পীড়াদায়ক হয়। কখনও কখনও ইহাতে সাংঘাতিক পীড়া উৎপন্ন হয়। সরল

শিশু অমৃত ভ্রমে বিষপান করিয়া অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করে। যাহাতে গর্ভাবস্থার স্তন্যপানে শিশুর জীবন বিপন্ন না হয়, পুতনাহত্যার চিত্রে সেই মহানীতি—অন্তর্নিহিত।

কৃষ্ণের রাসলীলা।—রাসলীলা বহুবিস্তৃত এবং মহানীতিপ্রদ। ইহার অন্তর্নিহিত উপদেশ মালা সঙ্কলনে সমর্থ হইলে, বহুশিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

স্থূল দেহে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, লৌকিক ভাবে কর্ত্তব্যের বিকাশ করা পরমাত্মার এক মাত্র ধর্ম্ম। কৃষ্ণ অবতারত্বে স্থূল দেহ ধরিয়া কোনই অলৌকিক কার্য্য করেন নাই, লৌকিক আচারে সাধারণ মনুষ্যব্যবহারে, তিনি সর্ব্বত্র স্বকার্য্য সাধন ও উদ্দেশ্য প্রতিপালন করিয়াছেন, যাহা মনুষ্যবুদ্ধিসাধ্য, যাহা মনুষ্যের জ্ঞান ও ক্ষমতার আয়ত্ব, সেই ভাবেই তাঁহার সকল সম্পন্ন হইয়াছে।

লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্য।

বেদান্ত।

আত্মা সর্ব্বগত, নিরঞ্জন ও নির্ব্বিকার, কিন্তু মূর্ত্তি পরিগ্রহ কালে তিনি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় লীলা করিয়া থাকেন।

মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বেজনাঅজ্ঞানসংবৃতা।
কথমেষাং ভবেন্মোক্ষ্য এতে বিষ্ণুরচিন্তয়ৎ॥
কথাং প্রথয়িতুং লোকে সর্ব্বলোকমলামহাং।
রামায়ণাভিধাং রামো ভূত্বা মানুষচেষ্ঠকঃ॥
ক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থ সিদ্ধয়ে।

তত্তৎ কামোচিতং গৃহ্নন্ মোহয়ত্যবশাঃ প্রজাঃ ॥

আধ্যাত্ম রামায়ণ।

"জ্ঞানশূন্য জনসমূহ মায়া কর্ত্তৃক মোহিত। পরমতত্ত্ব জানিবার ইহাদিগের কোন ক্ষমতাই নাই। ইহাদিগের মুক্তি চিন্তা করিয়া, ভগবান হরি, রামনাম ধারণ ও মনুষ্যরূপে অবতারত্ব গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বলোকের পাপরাশি বিদূরিত করিবার জন্য, মনুষ্যসাধ্য কার্য্যদ্বারা, লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত তৎকার্য্যে সাধনোপযোগী ক্রোধ—মোহ—কামাদি অবলম্বন করিয়া লোকসাধারণকে বশতাপন্ন করিয়াছিলেন।" কৃষ্ণও এই অভেদ উদ্দেশ্যের সাধন জন্য এই ভাবে অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে লোকশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনুষ্য লোকেরই উপযোগী। সংসারধর্ম্মশিক্ষা তাঁহার দ্বারকালীলা হইতে এবং পরমতত্ত্বশিক্ষা তাঁহার ব্রজলীলা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনেকে বলেন "শ্রীকৃষ্ণ যদি হরির অবতার হইলেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত তাঁহার জীবনে, জঘন্য শৃঙ্গাররসের অবতারণা করিয়াছিলেন, এবং কি নিমিত্তই বা অবলা ব্রজবালাগণের ধর্ম্মনাশ করিয়াছিলেন! ধর্ম্ম রক্ষার্থ যাঁহার আগমন, কি নিমিত্ত তিনি সতীর ধর্ম্ম সংহার করিলেন?" বিষয়টী বিবেচ্য বটে। আমরা স্বীকার করিলাম, কৃষ্ণ গোপরমণীকে প্রেমে মাতাইয়াছিলেন, স্বীকার করিলাম, কৃষ্ণ শৃঙ্গার রসের অবতারণা করিয়াছিলেন, এখন আমরা দেখাইব, সে কার্য্যের উদ্দেশ্য কি? কি নিমিত্ত তিনি এতাদৃশ ধর্ম্মবিরোধী কার্য্যের

সংঘটন করিয়াছিলেন। প্রথমবিবেচ্য—কোন্ স্থানে কোন্ রসের অবস্থান। শৃঙ্গারাদিরস মনুষ্যশরীরে বিভিন্নস্থানে অবস্থান করে।

শৃঙ্গারং শিরসি জ্ঞেয়ং
ক্রোধমাজ্ঞাপুরে তথা।
বিশুদ্ধাখ্যেভুকরুণাং
হৃদি ভীষণমেব চ॥
মণিপুরেঽদ্ভুতং হাস্যং
সাধিষ্ঠানে প্রকীর্ত্তিতম

মস্তকে শৃঙ্গার—ভ্রূমধ্যে রৌদ্র—কণ্ঠে করুণ—হৃদয়ে ভয়ানক—নাভিতে অদ্ভুত এবং লিঙ্গে হাস্যরসের অবস্থান। এই ষড়রসের যে যে স্থান নির্দ্দেশিত হইল, তাহার মধ্যে শৃঙ্গার রসেরই অবস্থান—শ্রেষ্ঠস্থানে (মস্তকে)। শৃঙ্গার রসের ভাবের নাম—মধুর। মধুর সর্ব্বসিদ্ধিসূচক। শাস্ত্রে মধুর ভাবের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত। শান্তদাস্যাদি পঞ্চভাবে, উপসনাবিধিও পঞ্চপ্রকার। শান্তভাবে—ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, 'দাস্যভাবে—সেবা, সখ্যভাবে—সমতা, বাৎসল্যভাবে—স্নেহ, এবং মধুরভাবে— আত্মদান বিহিত। শ্রীকৃষ্ণে আত্মদান বা পরমাত্মায় জীবাত্মায় সম্মীলন এই শৃঙ্গাররসের একমাত্র তাৎপর্য্য। জীবাত্মার পরমাত্মায় সম্মীলনেই তন্ময়ত্ব। যিনি তন্ময়—তিনিই মুক্ত। এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করুন, শৃঙ্গার রসের আভ্যন্তরিণ ভাব কত দূর উচ্চ।

তত্ত্বশাস্ত্রে, অনসূয়া, ক্ষমা, অহিংসা, শান্তি, দয়া, ধৃতি, মেধা, ও তুষ্টি এই আটটী গুণ জ্ঞানশক্তির সখী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রাধিকারও বৃন্দা, বিসখা, ললিতা ও চিত্রা ইত্যাদি অষ্ট সখী বর্ণিত। বৃন্দা,—রাধা কৃষ্ণের যুগলমীলনের জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত, স্বয়ং ভ্রমেও একদিন কৃষ্ণের সম্মীলন প্রত্যাশা করেন নাই—পাঠক, এই বৃন্দাই—অনসূয়া (যাহারঅন্তরে অসূয়া অর্থাৎ ঈর্ষ্যাদ্বেষের লেসও নাই)। আর বিসখা—রাধিকা কৃষ্ণের ব্যবহারে যেখানেই ক্রুদ্ধ হইতেছেন, সেই খানেই, বিসখা, কৃষ্ণকে ক্ষমা করিবার জন্যই রাধিকাকে অনবরত পরামর্শ দিতেছেন। পাঠক! এই বিসখাই ক্ষমা (যাহার অন্তরে পরকৃত অপরাধের সত্ত্বানুভূত হয় না)। রাধা—পরাশক্তি; চন্দ্রাবলী—অপরাশক্তি। তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত এই জ্ঞানশক্তির বিরোধাত্মিকা অবিদ্যাশক্তির, অশান্তি, অসূয়া, হিংসা প্রভৃতি সখী বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রাবলীর চন্দ্রাবতী, মধুমতী, সুন্দরী প্রভৃতি সখীগণ অভিন্নকল্প তাহাই মাত্র। পরাশক্তি সর্ব্বদাই ব্রহ্মে সম্মীলিতা, অপরা, কদাচিৎ তৎপদলাভে অধিকারিণী। পরাশক্তিস্বরূপিণী রাধিকা পরব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে নিরন্তর সম্মীলিতা, অপরাশক্তি চন্দ্রাবলী কদাচিৎ সম্মীলিতা। কৃষ্ণ কামরিপুর বাসনা পূর্ণ করেন না;—তিনি সকলের কামনা পুর্ণ করেন।

ব্রজলীলা—মায়ামোহের মুকুর স্বরূপ, আদর্শ ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া মাত্র। বলরাম—হলায়ুধরা বা সংকর্ষণ। কর্ষণই জীবের প্রাণ। অগ্রে সৃষ্টি—পরে পালন, সৃষ্টি হইলেও পালন ব্যতিত জীবের জীবন থাকে না; কৃষ্ণ স্রষ্টা—বলরাম পাতা,

ভাই, উভয়ে ভ্রাতৃভাব। শ্রীদামাদি সখাগণ সমদমাদির সাধন। উদ্ধব ও অক্রুর প্রভৃতি অণিমাদি ঐশ্বর্য্য স্বরূপ। কেশীকংসাদি দুষ্প্রবৃত্তির প্রতিকৃতি। মায়াত্মজা পুতনা নিকৃতি। যশোদা ধরণী। দেবকী ও বসুদেব আকাঙ্খা ও উদ্যোগ। হরি ধর্ম্মময়; ধর্ম্মসংগ্রহে যে কিরূপ আকাঙ্খা কিরূপ উদ্যোগের প্রয়োজন, দেবকী বসুদেবের কার্য্যই তাহার স্বরূপ নিদর্শন।

বলাসনবধ—বল অর্থে বীর্য্য, আসন অর্থে আশ্রয়, যাহা বীর্য্যের আশ্রয় স্বরূপ, তাহাই বলাসন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে কফ—বীর্য্যের জনক। উগ্রতায় কফের জন্ম; সেই কফ হইতে বীর্য্যের উৎপত্তি। বীর্য্য, পরমতত্ত্ব লাভের বিষমশত্রু। দৈহিকবীর্য্য দমিত না হইলে পারমার্থিক ধর্ম্মবীর্য্য লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। বীর্য্যের স্থান পিঙ্গলা। বীর্য্য পিঙ্গলা নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে দোষিত অর্থাৎ নিগৃহিত করে। যাহারা ধর্ম্মজ্ঞানহীন, তাহারা পিঙ্গলার নিগ্রহ তুচ্ছ ভাবিয়া, বীর্য্যের বীর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাহারই অনুধ্যানে জীবন যাপন করে, আর যাঁহারা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধু, তাঁহারা ঐ বীর্য্যের জনক বলাসনকে (কফকে) রমনক পর্ব্বতে নিক্ষেপ করেন, অর্থাৎ পাপাত্মাগণের হৃদয়রূপ রমনক পর্ব্বতে বলাসনরূপী বীর্য্য সমুৎপাদক কফকে নিক্ষেপ করেন। বীর্য্য তাঁহাদের নিকট হতবীর্য্য। বলাসন—কফ। কফের আশ্রয়-স্থল রমনক পর্ব্বত—অসাধুহৃদয়। কালীয়হ্রদ সাধুহৃদয়, পিঙ্গলা—যমুনা। পরমাত্মা—কৃষ্ণ। ইহাই কালীয়দমনের ভিত্তি। এই রূপক, পাঠকগণ অল্পমাত্র চেষ্টায় বুঝিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

পরমাত্মা, যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া প্রতিনিয়ত রাস-লীলায়, রত রহিয়াছেন। রাধিকা—যোগমায়া, কৃষ্ণ—পরমাত্মা। জীবদেহের সহস্রদলপদ্ম গোলক ধাম। পরমাত্মা সেই পদ্মদলে সমাসীন হইয়া নিত্য রাসলীলায় নিমগ্ন। বৃন্দাবন ধাম, গোলক মণ্ডলের অনুরূপ শিরঃস্থিত অধোমুখ সহস্রদলের কমলাক্ষ্য

"সহস্রপত্রকমলং ধ্যেয়ং মথুরমণ্ডলং।"

পদ্মপুরাণম্।

মাথুর মণ্ডলকে সহস্রদলরূপে চিন্তা করিবে। শিরঃস্থিত অধোমুখ পদ্মের দলসমূহও অধোমুখ, এই জন্যই বৃন্দাবনের তরুগণ অধোমুখ বলিয়া বর্ণিত।

ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ ঊর্দ্ধমুখ কমলের অভ্যন্তরে যেমন সাঙ্গ, অপাঙ্গ প্রভৃতি দ্বাদশ দল বর্ত্তমান, তদ্রূপ বৃন্দাবন মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণা সনে দ্বাদশদলের উল্লেখ দেখিতে পাই।

"ব্রহ্মরন্ধ্রে সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমদাতিমদ্ভুতং।
কুণ্ডলীবিবরকান্তমণ্ডিত দ্বাদশার্থসরসীরুহংভজে॥"

কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুতে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। এ বিষয় বিষ্ণুর ধ্যানমর্ম্ম দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ধ্যেয়ঃ স্বধা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী.
নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ,
কেয়ূরবান্ কণককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।

সবিতৃ—সূর্য্য। সবিতৃমণ্ডল অর্থে সূর্য্যমণ্ডল। যিনি সূর্য্য-

মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী, পদ্মে আসীন, কেয়ূর, কুণ্ডল, কিরীটী ও হার দ্বারা শোভিত, যিনি শঙ্খচক্রধারী ও সুবর্ণময়বপু, সেই নারায়ণকে সর্ব্বদা ধ্যান কর।

সূর্য্য সর্ব্বত্রগা নারায়ণ সেই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী।

নারায়ণ—নর শব্দে লোক, আর অয়ন শব্দে আশ্রয়, যিনি সর্ব্ব লোকের আশ্রয়, তিনি নারায়ণ।

সরসিজাসন—সরসিজ—পদ্ম; আসীন-স্থিত। পদ্ম—সত্ত্বগুণ, তিনি সেই সত্ত্বগুণে আসীন। সত্ত্বগুণ তাঁহার অবলম্বন, আবার সত্ত্বগুণের আশ্রয় স্থলও কেবল মাত্র তিনি।

কেয়ূরবান্—কেয়ূর শব্দসমুৎপাদন আকাশ স্বরূপ, আকাশ সর্ব্বব্যাপী তাই সর্ব্বব্যাপী হরি—কেয়ূর বান্।

কণককুণ্ডলবান্—কুণ্ডল দুইটী। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গানুসারী ভাবদ্বয়ই কুণ্ডল শব্দবাচ্য। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধভাবরূপ কুণ্ডলদ্বয় তাঁহার শ্রুতি মূলে সংযুক্ত।

কিরীটী—রাজচিহ্ন জ্ঞাপক। বিষ্ণু—জগতপালক জগদাধিপতি, সেই জন্য কিরীটী তাঁহার মস্তকে।

হারী— হারধারী। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সুপ্রবৃত্তি সমূহ একত্রে গ্রথিত এবং মধ্যে ধর্ম্মরূপ কৌস্তভে সুশোভিত রত্নহার তাঁহার কণ্ঠে।

হিরণ্ময় বপু—বিশ্বম্ভররূপ।

শঙ্খ—জলতত্ত্ব জ্ঞাপক।

চক্র—মায়াচক্র। যে চক্রে এই জগত সংসার পরিচালিত

হইতেছে, যে চক্র হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ও পাপ পুণ্যের দণ্ডপুরস্কার হইতেছে, এ সেই মহামায়া চক্র। চক্রধারী এই চক্র ধারণ করিয়া সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

কৃষ্ণ মুরলীধারী। সেই মধুর বংশীরবে গোপিনীগণ মোহিতা, সে মন প্রাণ বিমুগ্ধকারী রবে তাহারা উন্মত্তা—আত্মহারা। যে মায়াপাশে এই জগত সম্বদ্ধ, যে মায়ায় এই ব্রহ্মাণ্ডচক্র ঘুরিতেছে, সেই মায়া এই বংশীধ্বনী। মায়া না থাকিলে সংসার থাকে না। মায়ার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, মায়ার ভীষণ পাশে বদ্ধ হইয়া, জীব দিবারজনী সংসারচক্রে বিঘূর্ণিত ও সর্ব্বদা উন্মত্ত। পরকে মায়াদানে জীব স্বর্গসুখ অনুভব করে, পরের মায়ায় জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই মায়াবীর চরণে স্মরণ গ্রহণ করে। প্রেম, স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা সকলই মায়াপ্রসূত। প্রেমের জন্য জীব নিরন্তর ব্যাকুল। স্নেহ পাইতে, স্নেহ করিতে জীব বড়ই তৎপর। ভালবাসার জন্য সকলেই উন্মত্ত, ভালবাসা না থাকিলে, ভালবাসা না পাইলে কে না মৃত্যু কামনা করে? ভালবাসায় জীব সংসারের সকল যন্ত্রণায় সকল জ্বালায় শান্তিসুখ অনুভব করে। সকলের মূল মায়া। সৃষ্টি রক্ষার জন্য জগত মায়ায় বিজড়িত। শ্রীহরি মায়ায় সকলকে বদ্ধ করিয়া সংসার কার্য্য সাধন করিতেছেন, জগত সংসার রক্ষার জন্য মায়াই হরির অন্যতম প্রধান সাধন।

সংসার মায়াশূন্য হইলে সৃষ্টি কতক্ষণ থাকে? মায়াশূন্য হইয়া বাঁচিতে কে চাহে? যাঁহার মায়া আছে, সংসার তাঁহার সম্মুখে পবিত্রতার রাজ্য! তাঁহার সম্মুখে নিত্য জ্যোৎস্না বিরাজমান! তিনি পলে পলে জগতের নব নব

মূর্ত্তি দেখিতে পান। কৌমুদীর মধুর হাসি, অজ্ঞান শিশুর অমৃত নিস্যন্দী হাস্য, জ্যোৎস্নাধবল নিশীথে বাসন্তীসমীরণে দোদুল্যমান্ কুসুমরাজী, সর্ব্বদা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে। অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র তিনি সংসারের পবিত্রমূর্ত্তি দেখিতে পান। আর যিনি মায়াবিরহিত, প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা যাঁহার অন্তরে স্থান পায় নাই, তাঁহার নিকট সংসার মরু-ভূমি। লোকবিদগ্ধকারী সূর্য্যের উত্তাপ, প্রাণান্তকারী মরুভূমির উত্তপ্তবালুকা, কঙ্কালসার পার্থিববস্তু, তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাসিত হইয়া তাঁহাকে ভীষণ আকুল করিয়া তুলে। সংসারে তাঁহার অস্তিত্ব কোনও কার্য্যকর হয় না। তিনি সৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া সৃষ্টির বাহিরে থাকেন। আর, প্রেমিক যে জন, জীবন অনন্ত হইলেও তাঁহার সুখতৃষ্ণা ফুরায় না, সংসারে অশ্রদ্ধা জন্মে না, তাঁহার আশা অপরিসীম, ইচ্ছা অনন্ত,—সংসারবাসে তাঁহার স্পৃহা নিতান্ত বলবতী। সংসারের সারবত্তা—সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিরক্ষার প্রধান সাধন, তাঁহারই জীবনে। সুতরাং, মায়াই বিশ্ব সংসারের রক্ষাবন্ধনী স্বরূপ।

মায়াতে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তি,—নিবৃত্তিতে নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণই জীবের জীবনের প্রধান লক্ষ্য—সাধক জনের সাধনার ধন। জীবকে এই প্রবৃত্তিতে মাতাইয়া, বিশ্বসংসার পালন ও ভক্তের রঞ্জন জন্যই, নিরঞ্জন হরি মোহনমুরলীধারী হইয়াছেন। মায়ারূপ বংশীধ্বনী করিয়াই, কৃষ্ণ বংশীধারী। পাঠক স্পষ্টই বুঝিবেন।

আর এক কথা—কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতি পরিহার করিয়া গোপকুলে কি জন্য জন্ম গ্রহণ করিলেন? ধর্ম্ম ব্রাহ্মণেরই সম্যক

আশ্রিত। ধর্ম্মরক্ষা—ধার্ম্মিকের রক্ষা যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, তিনি ধর্ম্মময় ব্রাহ্মণজাতি উপেক্ষা করিয়া, গোপকুলে কি জন্য আবির্ভূত হইলেন? বেদবিদ্যাপারদর্শী, সর্ব্বজ্ঞানদর্শী, সর্ব্বজাতিশ্রেষ্ঠ—ব্রাহ্মণ। তবে ব্রাহ্মণেতর জাতিতে কৃষ্ণের জন্ম কি জন্য? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে কৃষ্ণ যে বংশে সম্ভূত হন, তাহা আধুনিক গোয়ালাজাতি প্রতিপাদক গোপ নহে। গুপ্ ধাতু রক্ষণে। যাঁহারা ধর্ম্মরক্ষা করেন, ধর্ম্ম যাঁহাদিগের রক্ষিত—তাঁহারাই গোপ। আর কৃষ্ণও এই গোয়ালার ঘরে গোপাল (রাখাল) ছিলেন না। গো—পৃথিবী, পাল পালন কর্ত্তা। জগতকে যিনি পালন করেন, তিনিই গোপাল।

কৃষ্ণ যে পূর্ণব্রহ্ম, তাহাতে যিনি সন্দেহ করেন, তিনি এ গভীরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি—

এতে চাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকে মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

ধর্ম্মজগতে অরাজকত্ব দেখিলেই তিনি তৎপরিত্রাণ জন্য যুগে যুগে অবতারত্ব গ্রহণ করেন।

গোবর্দ্ধনধারণ—অন্য কিছুই নয়; রূপকে ধরাধারণ মাত্র। কৃষ্ণের পরামর্শে গোপগণ গিরিযজ্ঞ সমাপন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র, সংবর্ত্তকাদি মেঘগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "মেঘগণ! যদি তোমাদিগের রাজভক্তি থাকে, আমার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান যদি তোমাদিগের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। নন্দ প্রভৃতি কৃষ্ণপরায়ণ গোপগণ, বৃন্দাবনের উৎসবে আমাকে অবহেলা

করিয়াছে। গিরিযজ্ঞে আমি আহুতি পাইনাই, অতএব তাহাদের জীবনস্বরূপ গোধনে বঞ্চিত করিয়া, আমি তাহাদিগকে হতজীবন করিব। সপ্তরাত্রব্যাপী ভীষণ ঝটিকাবৃষ্টি দ্বারা বৃন্দাবনস্থ সমস্ত গোধন বিনাশ কর। আমিও বজ্রকর হইয়া ঐরাবতারোহণে সত্বর তোমাদের নিকট উপস্থিত হইব। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুর সহিত ভীষণবর্ষণ করিয়া যাহাতে ধেনুগণ সত্বর সবৎস্যে নিহত হয়, তাহার বিধান কর।”

মেঘগণ ইন্দ্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল। পর্ব্বতাকার কৃষ্ণমেঘজালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইয়া প্রলয়োপম দৃশ্যে ব্রজ গোপগণকে ভীত করিয়া তুলিল। অনবরত মুষলধারায় ঝঞ্ঝা—বৃষ্টি, তদুপরি ইন্দ্রের বজ্র নির্ঘোষ যুগপৎ গোপগণের শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিষম সমাকুল করিয়া তুলিল। বৎস্যগণ নিতান্ত ভীত এবং অনন্যোপায় হইয়া জননীর প্রতি সভয়নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুতের দৃষ্টিবিভ্রমকারী আলোকে গোপব্রজের চক্ষু ঝলসিত হইয়া গেল। গোপগণ নিতান্ত বিপন্ন হইয়া কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইল, তটস্থ হইয়া কহিল, “হে দামোদর! আমাদিগকে পরিত্রাণ কর”। কৃষ্ণ গোপগণকে আকুলিত হইতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করত ব্রজপুরীর প্রান্তবর্ত্তী গোবর্দ্ধনপর্ব্বত উত্তোলন পূর্ব্বক করাঙ্গুলিদ্বারা ধারণ করিলেন। ব্রজবাসীগণ সপরিবারে ধেনুবৎস্য সহিত তন্নিম্নে আশ্রয় পাইয়া ভীষণ দুর্যোগ ঝঞ্ঝাবৃষ্টি হইতে সংরক্ষিত হইল। সকলে বিস্ময়—স্তম্ভিত হৃদয়ে কৃষ্ণকে একবাক্যে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

ইন্দ্র তাঁহার সমুদায় চেষ্টা বিফল হইতে দেখিয়া বিষম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি নন্দনন্দনের নিকট গমন করিয়া কহিলেন "হে কৃষ্ণ! আপনার কার্য্য দেখিয়া আমি যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হইয়াছি। আপনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াও রোষাবিষ্ট হৃদয়েও যে স্বীয় পূর্ণতা গোপন করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা মহত্ব আর কি হইতে পারে? আপনি যে দেব-কার্য্য সাধনার্থ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন, যে কার্য্য ভার লইয়া অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, দেবভাগ্যে তাহা যে সুসিদ্ধ হইবে, আজি তাহা আপনি প্রকারান্তরে জানাইয়া দিলেন। আপনি যে বিশ্বচক্রের মুলচক্রী, চক্র করিয়া সমগ্র সুরনর-বর্গের ইষ্ট, বিশিষ্ট উপায়ে রক্ষা করিতেছেন, আপনার বর্ত্তমান কার্য্যে তাহার প্রত্যক্ষ অন্যতম উদাহরণ প্রাপ্ত হইলাম। আপনি পরাৎপর পূর্ণব্রহ্ম, অজ্ঞানান্ধের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন। স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা, সকলই আপনি, আপনার চরণে কোটীকোটী নমস্কার।" এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণকে প্রসন্ন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এইটুকু গোবর্দ্ধন ধারণের ঐতিহাসিক ঘটনা। ভগবান হরি, সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে যে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের হিতসাধন করিয়াছিলেন, কবিগণ কৃষ্ণের পূর্ণত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য, কৃষ্ণ চরিত্রে সেই সেই অবতারের কার্য্যকলাপ প্রকারান্তরে সমাবিষ্ট করিয়া অলোকসুলভ ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এ সকল কথা যদি অবসর হয়, তবে পরিশেষে বিবৃত হইবে।

প্রলয় কালে জগত জলময় হইয়া যায়, প্রবল জলতাড়নে

লোকসমূহ নিধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন জগত অনন্ত বারিরাশিতেই পরিণত হয়। এইরূপে যখন মহাজলপ্লাবন-প্রলয় সমুপস্থিত হইল, তখন লোক সমূহ "হা মধুসূদন! হা দীনবন্ধু! হা হরি রক্ষাকর।" বলিয়া আসন্নবিপদে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিল। ইন্দ্র আকাশদেবতা, অনবরত মুষলধারে ভীষণবর্ষণ করিয়া কারণার্ণবে জগত পরিপ্লাবিত করিলেন। স্থলভাগ জলভাগের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তরূপী ভগবান হরি তখন সৃষ্টি ও ভক্তগণের রক্ষাসাধনার্থ, বিশ্বব্যাপী বারীরাশি হইতে ধরণী উত্তোলন করিয়া সহস্র মস্তক পাতিয়া ধারণ করিলেন। জলতলে ধরা নিমগ্ন ছিল, এক্ষণে জলভাগ হইতে স্থলভাগ ঊর্দ্ধে উন্নিত হইল। সাধুগণ সেই উন্নত ভূভাগে বসতি করিয়া দুস্তর জলভয় হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইলেন।

অভিনব জীবে ধরণী পুনঃ পরিপূর্ণ হইল। এই ঘটনা রূপকাকারে লিখিত ও পরিণামে ধরাধারণের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন ধারণ হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। যে শক্তি জলভাগ হইতে স্থলভাগকে পৃথক্ রাখিয়াছে, যে শক্তি জগতকে যথাস্থানে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, ভগবান হরির সেই শক্তির নাম—অনন্ত। যে শক্তি এই গ্রহনক্ষত্রসম্বলিত বিশাল জগত অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে; ভৌতিক সৃষ্ট পদার্থ পরস্পরা পরস্পর সংস্পৃষ্ট ও সংযোজিত হইবার প্রত্যেক লক্ষণ বর্ত্তমানেও যে শক্তি বলে তাহা হইতে পাইতেছেনা, সে শক্তি যে অনন্ত, তাহাও কি আর বলিতে হইবে? যে শক্তি চন্দ্র সূর্য্য ও জগতকে সূক্ষসূত্রে আবদ্ধ রাখিয়া চক্রাকারে বিঘূর্ণিত করিতেছে, যে শক্তি স্থল ও জলের ব্যবধানরূপী হইয়া অনির্ব্বচনীয়

সৃষ্টিসৌকর্য্য সাধন করিতেছে, যে শক্তিতে পর্য্যায়ক্রমে ষড়-ঋতুর আবির্ভাব হইতেছে। গ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব কক্ষে প্রতিনিয়ত নিয়মিতরূপে বিঘূর্ণিত হইতেছে। সেই অতুলনীয় মহা-শক্তি যে অনন্ত এবং অদ্বিতীয় ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। আইস পাঠক! এই অনন্ত অদ্বিতীয় শক্তির নিকট আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তিটুকু উপহার দিয়া মহাশক্তির চরণে প্রণত হই। মহাশক্তির সাধনায় স্ব স্ব জীবন নিয়োজিত করি।

নবনীত হরণ—কৃষ্ণ বাল্যজীবনে নবনীত হরণ করি-তেন। গোপ গোপিনীগণের বহু পরিশ্রমজাত দুগ্ধমথিত নবনী কৃষ্ণ গোপনে গ্রহণ করিতেন। এ কথার তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রক্ষার্থ গুপ্‌ ধাতু হইতে গোপগোপিনীপদ নিষ্পন্ন। যাঁহারা ধর্ম্ম রক্ষা করেন তাঁহারাই গোপের প্রকৃতি গোপিনী। দুগ্ধস্বচ্ছ ধার্ম্মিক হৃদয়। সেই জন্য ধর্ম্মরক্ষাকারিণী গোপিনী-গণের দুগ্ধরূপ ধর্ম্মই একমাত্র অবলম্বন। ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের প্রাণ। দুগ্ধই গোপিনীগণের প্রধান সম্বল। সেই দুগ্ধরূপ ধার্ম্মিক হৃদয় মন্থন করিয়া বা ধর্ম্মালোচনা করিয়া যে নবনীত অর্থাৎ সার-মোক্ষ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় কৃষ্ণ তাহাই গ্রহণ করেন.—অর্থাৎ কৃষ্ণ তাহা আপনাতে সংযুক্ত করেন। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যা গোপিনী-গণের নবনীত স্বরূপ মোক্ষ ধর্ম্ম, স্বধর্ম্মে সংযুক্ত করেন। মুক্তির উপযোগী আত্মা আপনা হইতেই ঈশ্বরে সংযুক্ত হয়। সাধক! তুমি মুক্তিজন্য চিন্তা করিও না, মোক্ষ পথ ভাবিও না, একাগ্র—মনে ধর্ম্মার্জ্জন কর, স্বীয় দুগ্ধফেননীভ অনিত্যহৃদয় মন্থন করিয়া সারবান মোক্ষলাভোপযোগী নিত্যনবনীত সঞ্চয় কর, ভগবান কৃষ্ণ আপনা হইতে তোমার সে নবনীত গ্রহণ করি-

বেন, তোমার মুক্তির যথাবিধি সুবিধান করিবেন। মুক্তির ভার তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিবিষ্টমনে ধর্ম্মার্জ্জন কর। মোক্ষ তাঁহার নিকট. তিনিই তোমার কর্ম্মোচিত ফল প্রদান করিবেন।

অনেকে বলেন কৃষ্ণ অবতার নহেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ বলরামই অবতার। হরির অংশই অবতার বলিয়া অভিহিত। সুতরাং, স্বীকার করা উচিত যে, কৃষ্ণ অদ্বিতীয় পূর্ণাবতার, কৃষ্ণ ভিন্ন অন্ত সমস্ত অবতারই—অংশ। পূর্ণাবতার কৃষ্ণভিন্ন অন্য নাই। আমরা বলরামকে কৃষ্ণাবতারের স্থানে স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছি।

বলরাম—কৃষিযুগে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যে গোচারণে নিযুক্ত, যৌবনে হলধারী। এখন আর জগতের সে ভাব নাই। প্রকৃতির হাস্যময়ী প্রশান্তমূর্ত্তি অন্তরিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ঘোর বিষাদ—মরিচিকার আশ্রয় স্থল হইয়া উঠিয়াছে। ধরণী রক্তস্রোতে ভাসমানা। কেহ জীবনোপায় চিন্তা করে না, সকলেই প্রতিদ্বন্দ্বীর শোণিতে স্বকীয় তরবারী রঞ্জিত করিতে অভিলাষী। জনসাধারণ সকলেই সৈনিক শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট, তাহাদিগের আহার্য্যের সংস্থান করে কে? সুতরাং, ক্রমশঃ আহার্য্যাভাবে জীবগণের জীবন বিপন্ন হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, এই সময় বলরাম, জননী ধরণীকে কর্ষণ করিয়া আহার্য্য সংস্থান করিবার উপদেশ জনসাধারণে প্রচারিত করিবার জন্য আবির্ভূত হন। তাঁহার উপদেশানুসারে জগতের নিকৃষ্ট সম্প্রদায় হলাকর্ষণ করিয়া অচিরে প্রভূত ধনধান্যশালী হইয়া উঠিল। প্রকৃতি আবার হাস্যময়ী হইলেন। বাল্যে বল-

নাম—গোপাল। এই কৃষি কার্য্যের সূত্রপাতের সহিত প্রকৃত গো পালন আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে যজ্ঞ প্রভৃতিতে মধুপর্কের জন্য লোকে গোপালন করিত, এখন হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে গোপালন আরম্ভ হইল। জগতস্থ জনগণ বলরামপ্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিয়া, অচিরে ধন ধান্যযুক্ত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। বলরাম—কর্ষণাবতার। তৎপ্রদর্শিত পন্থা তৎকালে অনুসৃত না হইলে এতদিন কে এ জগতের নাম জানিত? কে এখন পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইত?

বস্ত্রহরণ—গোপিনীগণের বস্ত্রহরণ ব্যাপারে অনেকে কৃষ্ণচরিত্রে দোষার্পণ করিয়া থাকেন। পরন্তু, ইহার মর্ম্ম সম্যক্ অবধারণ করিতে পারিলে কৃষ্ণের প্রতি বস্ত্রহরণজনিত কলঙ্ক আরোপ করিবার কোনও কারণই পরিলক্ষিত হইবে না। প্রথমতঃ ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ আলোচনা করা যাইতেছে। গোপিনীগণ ব্রত সমাপন করিয়া নগ্নাবস্থায় জলকেলী করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কৃষ্ণ সেই বস্ত্র অলক্ষে কুক্ষিগত করিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করেন। গোপিনীগণ জলকেলী সমাপন করিয়া তীরে বস্ত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিল, নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বস্ত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে। গোপীগণ তদ্দর্শনে ভীতা হইয়া চতুর্দ্দিকে সন্দেহবিজড়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, কৃষ্ণ বসনসমূহ অপহরণ করিয়া লুক্কাইত ভাবে অবস্থান করিতেছেন। পরিশেষে গোপিনীগণ বস্ত্রলাভার্থে কৃষ্ণ সমীপে মিনতিস্তুতি করায় তিনি তাহাদিগকে পর্য্যস্তব করিতে অনুমতি করিলেন। গোপিনীগণ তথাবিধ

আচরণ করিলে তিনি তাহাদিগকে স্ব স্ব বসন পুনঃপ্রদান করিলেন। ইহাই বস্ত্র হরণের মূল। এক্ষণে ইহার আভ্যন্তরিক রহস্য নিষ্কাসন করিতে সচেষ্ট হওয়া যাইতেছে।

এই ব্যাপারে, রূপকাকারে যে কয়েকটী বিষয়ের প্রসঙ্গত উল্লেখ আছে, তাহার স্থূলমর্ম্ম;—নগ্নতা—পাপ, বসন—ধর্ম্ম, কৃষ্ণ—পরমাত্মা, কদম্ববৃক্ষ—জগন্মণ্ডলময় মহাবৃক্ষ, সূর্য্য—সর্ব্বাচ্ছাদক, নদী—পাপের স্রোতস্বতী। এখন এই কথা কয়েকটীর সামঞ্জস্য কি, তাহাই দেখা যাউক।

ব্রত—লৌকিকাচারমাত্র। ঈশ্বরে ভক্তি না থাকিলে ব্রতে কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাহ্যে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া, অন্তরে যথেষ্ট পাপার্জ্জন করা যাইতে পারে। ইহার ভূরিদৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মিথ্যাপ্রবঞ্চনাদি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই ব্রতানুষ্ঠান করিলেও মিথ্যাপ্রতারণাজনিত পাপ-রাশি হইতে কদাচ নিস্তার প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। পরের স্বার্থ নষ্ট করিয়া নিজের স্বার্থ রক্ষা করিয়া, পরের অহিত দ্বারা নিজের হিত সাধন করিয়া মুখে কেবল মাত্র "হরি বোল! হরি-বোল" বলিলে কি স্বার্থান্ধতার ভীষণ পরিণাম অতিক্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায়? বাহ্যিক ধর্ম্মলক্ষণ প্রদর্শন কি পাপ নিষ্কাসনের হেতু? না মোক্ষ লাভের সেতু? অভিষ্ট দেবে ভক্তি না থাকিলে ব্রতানুষ্ঠান বৃথা। এই উপদেশ প্রদানের জন্য, গোপিনীগণ ব্রত সমাপন করিয়াও নগ্নশরীরে পাপনীরে ক্রীড়া করিতে-ছিলেন। তাঁহারা ব্রত সমাপন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু, নিত্য-সত্যব্রত হইতে পারেন নাই, সেই জন্য ধর্ম্মবাস পরিত্যাগ করিয়া পাপহ্রবাসে পাপসরসে ক্রীড়া করিতে ছিলেন।

ধর্ম্ম দেহীর প্রাণ। তাহা পরিহার করিয়া পাপানুষ্ঠান করিলে, আর কি তাহার পুনঃ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে? সেই জন্য গোপিনীগণ তীরে উঠিয়া আর বসন পাইলেন না। ধর্ম্ম, তাহার আশ্রয় স্থান ত্যাগ করিয়া যথায় উৎপত্তি—তথায় নিবৃত্তি লাভ করে। এ জন্য সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক কৃষ্ণে, ধর্ম্মরূপ বসন সংযুক্ত হইল। কৃষ্ণ ধর্ম্মবসন প্রত্যাহরণ করিলেন। গোপিনীগণ দেখিল, কৃষ্ণ বসন আহরণ করিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়াছেন। কদম্ব বৃক্ষ—মহাবৃক্ষ। কদম্ব জগতের অনুরূপ। বিজ্ঞানের গভীরতত্ত্ব অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধ হয় যে, একমাত্র কদম্বই জগতের তুলনীয়। জগত গোলাকার, কদম্ব ও তদ্রূপ। কদম্বের কেশরগুলি জীবসঙ্ঘ। কদম্বের উপরে ও নিম্নে চতুর্দ্দিকে কেশর থাকিয়াও স্খলিত হইতেছে না, তদ্রূপ নিম্নোপরে জীবসমূহ পৃথিবীতলে পদ স্থাপন করিয়া থাকিয়াও কেহ স্খলিত হইতেছে না। পাঠকগণ, একটী কদম্ব লইয়া জগতের সহিত তুলনা করিলেই, এই তত্ত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

কদম্ব বৃক্ষ—মহাবৃক্ষ। ইহাতে কোটী কোটী কদম্বরূপী জগত দোদুল্যমান। বিশ্বে কতগুলি জগত—কে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়? সেই মহাবৃক্ষে কত কোটী কোটী জগত ঝুলিতেছে, কত ক্ষুদ্র বৃহৎ জগত নিরন্তর প্রসূত ও অন্তর্হিত হইতেছে, কৃষ্ণ সেই মহাবৃক্ষে আসীন হইয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিতেছেন!!

গোপিনীগণ, স্বকীয় পাপময়তা উপলব্ধি করিয়া বিষম

লজ্জিতা হইল; ধর্ম্মবাস পরিহার করিয়া পাপ-নগ্নতার আশ্রয় হেতু, গোপিনীগণ বিষম আকুলিত হইল; তখন পুনরায় তাহারা ধর্ম্মনিয়ামক শ্রীহরির নিকট ধর্ম্মবাস প্রাপ্তির জন্য যুক্তকরে প্রার্থনা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ গোপিনীগণের পাপ বর্জ্জনের ঐকান্তিকী ইচ্ছা এবং হৃদয়ের বিজাতীয় অনুতাপ অনুভব করিয়া সূর্য্যকে প্রসন্ন করিবার জন্য গোপিনীগণকে অনুমতি প্রদান করিলেন। সূর্য্য—সর্ব্বাচ্ছাদক, তমঃ নাশক, তিনি সর্ব্বত্রেই তমোরাশি ধ্বংস করেন। অতএব সকলের আচ্ছাদন-কারী এবং পাপতমঃ বিনাশী সূর্য্যের উপাসনাই এস্থলে কর্ত্তব্য। গোপিনীগণ, যাঁহার উপাসনায় পাপতমঃ বিনষ্ট হয়, সেই সূর্য্যের স্তব করিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠানে তাহাদিগের পাপ রাশি ধ্বংস হইলে, কৃষ্ণ পুনরায় তাহাদিগকে ধর্ম্মবাস প্রদান করিলেন।

বস্ত্রহরণ জন্য যাঁহারা কৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্কার্পণ করেন, তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই বস্ত্রহরণ ব্যাপারের রহস্য কতদূর গূঢ়!

এ সকল বিবেচনা করিয়াও যদি তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে পূর্ব্বভ্রম অপনিত না হয় এ সকল তত্ত্ব বুঝিয়াও যদি তাঁহারা পবিত্রচরিত্রে কলঙ্কার্পণ করেন, তবে বুঝিব, আমাদি-গের অদৃষ্ট নিতান্তই অপ্রসন্ন; আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারি না; ধর্ম্মের তত্ত্ব, কবিগণের কল্পনার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া, তাহা হইতে সত্য নিষ্কাসন করিবার ক্ষমতা আজিও আমাদিগের হয় নাই।

অনেকে নিজ হৃদয়ের কথা গোপন রাখিয়া, তুচ্ছ তর্কের

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অনর্থক বাগাড়ম্বরে বৃথা সময় নষ্ট করেন। তাঁহারা যে তত্ত্ব বুঝেন, তাহারও বিপক্ষমত ঘোষণা করিয়া স্বীয় তর্কশক্তির পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব, তর্কের বিষয় নহে, ইহা স্বতঃই হৃদয়ে উপলব্ধ হয়।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।"

ধর্ম্মতত্ত্ব মানবের হৃদয়গুহায় নিহিত; তাঁহারা তদ্দারা কৃষ্ণচরিত্র সমালোচন করেন, ইহাই আমাদিগের এক মাত্র প্রার্থনা।

কৃষ্ণকালী—পবিত্র ঘটনা—রহস্যের ভাণ্ডার। একদা কৃষ্ণ রাধিকার সহিত কুঞ্জবিহার করিতেছেন, এমত কালে আয়ান, জটীলাকুটীলার পরামর্শানুসারে, অভিসারিকা রাধিকাকে সমুচিত শিক্ষা দান করিবার জন্য কুঞ্জাভিমুখে গমন করিল। রাধিকা আয়ানকে সমাগত দেখিয়া ভীতা হইলেন, এবং কৃষ্ণকে এই আসন্ন-বিপদ-বার্ত্তা নিবেদন করিয়া তদুপায় নির্দ্ধারণে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, সেই বিপদ হইতে রাধিকাকে উদ্ধার করিবার জন্য, দিব্য কালীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কৃষ্ণ, মোহন বাঁশীর পরিবর্ত্তে শাণিত অসি, বনমালার স্থানে মুণ্ডমালা, পীতধড়ার পরিবর্ত্তে নরকরকিঙ্কিণী, চূড়ার পরিবর্ত্তে দিব্য মুকুট ধারণ করিয়া শ্যামকায় দিব্য শ্যামামূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আয়ান দেখিল, রাধিকা নিভৃতে কালীপূজায় নিযুক্তা, তখন আয়ানের ক্রোধ শান্তিতে পর্য্যবসিত হইল। আয়ান ভক্তিভরে জানুদেশ নত করিয়া দেবীকে প্রণিপাত করিল। রাধিকার প্রতি তাঁহার যে ক্রোধ সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে জটীলা-

কুটীলাব দিকে ধাবিত হইল। আয়ান, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া জটীলাকুটীলাকে বিশেষ ভৎর্সনা করিল। রাধিকাও এই আসন্নবিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পুলিন বিহারী শ্রীহরির চরণে একমনে মনঃ সংযোগ করিলেন। ঘটনা এই পর্য্যন্ত, এখন ইহার মর্ম্মাবধারণে সচেষ্ট হইতে হইতেছে।

আয়ান—ক্রোধের বিকটমূর্ত্তি, জটীলা—প্রবৃত্তি এবং কুটীলা—প্ররোচনা স্বরূপিণী। ক্রোধের ভগিনী জটীলা কুটীলা, ঋপুর পরিপোষক, এবং উত্তেজক। রাধিকাকে কুঞ্জবিহারে গমন করিতে দেখিয়া প্ররোচনা, প্রবৃত্তির সহিত মিলিত হইল। প্রবৃত্তি ক্রোধের নিকট গিয়া কহিল "তোমার স্ত্রী অপরের সহিত বিহার করিতে গমন করিল, আর তুমি এখানে নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ?" প্ররোচনা কহিল "তাইত? তুমি উঠ, চল, এখনি সেই পাপিনীর সমুচিত শাস্তি দিবে, আর বিলম্ব করিও না।" প্ররোচনা কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া ক্রোধ প্ররোচনাকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিল। বলিল "তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী, চল, তুমি যেখানে লইয়া যাইবে সেই খানে যাইব।" প্ররোচনা তখন ক্রোধকে সঙ্গে লইয়া ঘটনা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। যেরূপ দেখিল, সেইরূপ কার্য্য করিল। যদি ক্রোধের স্থান পাইত, তবে প্ররোচনা সহযোগে তথায় ক্রোধের যথেষ্ট কার্য্য প্রদর্শন করিত। ক্ষেত্র না পাইলে কার্য্য হয় না। যেখানে ক্ষেত্র নাই, তথায় ক্রোধ সুতরাং সংযত হইলেন। আয়ানের ক্রোধ ক্ষেত্রাভাব নিবন্ধন পরিস্ফুট হইতে পাইল না, ক্ষেত্রাভাবে প্ররোচনা ও উত্তেজনা কার্য্যে কোন কার্য্যই সাধন করিতে পাইল না।

কৃষ্ণ ও কালী যে এক, যিনি শক্তি তিনিই যে পুরুষ, তাহাই

দর্শন করিবার জন্য কৃষ্ণ,—কালীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের সম্মীলন এই স্থানে। কৃষ্ণ স্বয়ং কালী। যাঁহারা দেব দেবী পৃথক জ্ঞান করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। যখন যে কোন মূর্ত্তিতে যে কোন দেবদেবী সম্মুখে দেখিবেন, সকলই সেই—হরি!—পাঠক! শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর বা গাণপত্য সকলেরই মূল সেই এক—হরি! যদি ভেদ জ্ঞান কর—তুমি ভ্রান্ত। যাঁহারা কৃষ্ণকে স্পষ্ট গোপনন্দন জ্ঞানে ঘৃণা করেন, তাঁহারা ততোধিক ভ্রান্ত। শাক্তে বৈষ্ণবে প্রভেদ নাই, যিনি শক্তি তিনিই বিষ্ণু; তাই কৃষ্ণ—কালী।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

ষষ্ঠ ভাষ।

অতি বিস্তির্ণ অরণ্য।—শাল—পিয়াল—তমালাদি বহুবিধ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখায় অরণ্যময় অন্ধকারের রাজত্ব। এক ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে একটী মহাতরু মূলে যোগাসনে এক জন যোগী আসীন রহিয়াছেন। প্রধূমিত হোমবহ্নি জিহ্বা প্রসারণ করিয়া যেন অরণ্যকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, যোগী গোলাকার অগ্নিপরিখা মধ্যে ভস্মগাত্রে মুদ্রিতনেত্রে ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন। সে যোগের বিরাম নাই, যোগাচার অবিরাম সমভাবে চলিয়াছে। যোগীর কামনা অসম্ভব, তাই পূর্ণ হইতে

এত বিলম্ব। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া যায়, যোগীর যোগ আর ভঙ্গ হয় না, এইরূপে দিন যাইতে লাগিল।

এইরূপে কত দিন অতিবাহিত হইল। একদিন প্রভাতে বালসূর্য্য কিরণ সদৃশ দীপ্তিমান, অলৌকিক প্রভাবিশিষ্ট চতুর্ম্মুখ এক জ্যোতিম্ময় মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। মূর্ত্তির পরিধানে রক্ত বস্ত্র, দেহজ্যোতি প্রদীপ্ত সূর্য্যসদৃশ। তিনি সমাগত হইয়া কহিলেন "বৎস! বরং বৃণু।" যোগী সংজ্ঞাহীন, একতান মনে ইষ্ট চিন্তাতেই নিমগ্ন। দেবমূর্ত্তি পুনরায় কহিলেন "বৎস! বরং বৃণু।" তথাপি উত্তর নাই। স্পন্দশব্দশূন্য, নিমেষবিরহিত নেত্রে যোগী তথাপি ইষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁহার হৃদয়ের সহিত অভিষ্টমূর্ত্তি বিশিষ্টরূপে সংযুক্ত, সে সংযোগের বিয়োগ—বহু যোগ সাধ্য। আগন্তুক পুনরপি কহিলেন "বৎস! ইষ্ট চিন্তায় বিরত হইয়া অভিষ্ট বর প্রার্থনা কর।" এতক্ষণে যোগীর মহাযোগ ভঙ্গ হইল। চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ব্রহ্মা। যোগী, পরম ভক্তিভরে প্রণত হইয়া কহিলেন, "কত দিন? আর কত দিন, প্রভু, এইরূপ যন্ত্রনা সহ্য করিব?" ব্রহ্মা প্রীত হইয়া কহিলেন, "হিরণ্যকশিপু! আমি তোমার স্তবে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি যেরূপ একাগ্রতার সহিত আমার সাধনা করিয়াছ, তাহা জগতে অতুলনীয়, এক্ষণে মনের ক্ষোভ পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিব।' হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার ঈদৃশ সদয় ভাব দর্শন করিয়া সোৎসুক্যে কহিলেন "প্রভু! যদি দাসের প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যেন জগতে দেব দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ, কিন্নর, নর, বানর বা সিংহ ব্যাঘ্রাদি জীব

সকল আমাকে বিনষ্ট করিতে না পারে। আমি যেন ইন্দ্র, পবন বরুণ, সোম, দিকপালগণ, ধনাধিপতি, যম, মরুদ্গণ বা পন্নগগণের আধিপত্যে স্বর্গরাজ্য উপভোগ করি। পট্টিশ, তোমর, শেল, শূল, গদা, পরশু, ভিন্দিপাল, খড়্গ সায়কাদি ত্রিলোকের অস্ত্র শস্ত্রে যেন আমার শরীর বিদ্ধ না হয়। আমি যেন জগতের দ্বিতীয় স্রষ্টার ন্যায় বিরাজ করি। জগতে আমার যেন প্রতি-যোগী কেহ না থাকে। দৈত্যগণ অক্ষত শরীরে যেন সর্ব্বদা আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে। জরা, মৃত্যু যেন আমার শরণাগত এবং আমার ইচ্ছামত পরিচালিত হয়। স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতালে যেন আমি অজেয় হইয়া অবস্থান করি। দৈত্যগণ যেন অজয় অক্ষয় থাকিয়া ভুবনের সর্ব্বত্র সদা বিচরণ করে। হে লোক পিতামহ! আমাকে অভিলষিত বর প্রদানে মনস্কামনা পূর্ণ করুন। ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুর এতাদৃশী প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া যারপরনাই সন্ত্রাসিত হইলেন। কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া, বিরসবদনে কহিলেন "বৎস! তুমি এ বাসনা পরিহার করিয়া অন্যবর প্রার্থনা কর, আমি অবিলম্বে তাহা প্রদান করি-তেছি। দৈত্যগণ কর্তৃক ধরা শাসিত হইলে, তাহা কদাচ স্থির ভাবে অবস্থান করিবে না। আমি যে জন্য জগত সৃষ্টি করিয়াছি দৈত্যগণের দ্বারা তাহা সিদ্ধ না হইয়া বরং অচীরে জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তুমি আমার পরম ভক্ত, আমি তোমার সর্ব্বদা আরাধ্য——আরাধ্য দেবের অভিষ্ট বিরোধী হইয়া বিপরিত বিধানে কেন সৃষ্টি ধ্বংস করিবে? আর তাহাতে তোমার ইষ্টই বা কিরূপে সম্ভবে? তুমি অন্য যে বর প্রার্থনা করিবে; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। বৎস!

আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি এ সংকল্পের বিকল্প বিধান কর।” ব্রহ্মার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হিরণ্যকশিপু কহিল “এতক্ষণে বুঝিলাম, দেবগণ স্বার্থপরের চূড়ামণি, অগ্রে জানিতাম না, দেবগণ স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য ভক্তের স্বার্থ অবাধে নষ্ট করিতে পারেন। জানি না, লোকে কি জন্য বৃথা দেবারাধনায় কালাতিপাত করে। যে নিজের শিষ্যের বাসনা পূর্ণ করিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, আমি তাহার নিকট সাধনা প্রার্থনা করিয়া কি ভস্মে ঘৃতাহুতি দিলাম? আমি নিতান্ত মূঢ় নির্ব্বোধ! নতুবা দেবারাধনায় সময় নষ্ট করিব কেন?' ইচ্ছা করিলে বাহুবলে আমার সকল বাসনাই পূর্ণ করিতে পারিতাম। পিতামহ! আমি যে বর প্রার্থনা করিলাম যদি ইচ্ছা হয়, ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে আমাকে ইচ্ছামত বর প্রদান কর। নতুবা স্বস্থানে প্রস্থান কর। আমি বাহুবলে আমার বাসনা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হই—তোমরা আজ হইতে আমার শত্রু। যথাসাধ্য প্রতিযোগীতার চেষ্টা কর। আমি তোমাদের শতচেষ্টা বিফলীভূত করিয়া স্বাভিষ্টসাধনে অগ্রসর হই। আর যদি তোমাদের প্রতিযোগীতায় আমার জীবনও বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। যাহার বাসনা পূর্ণ হয় না, যে নিজের বাসনা পূর্ণ করিতে অক্ষম, মৃত্যুই তাহার একমাত্র শান্তি। আমি সে শান্তিসুখ উপভোগ করিতে কুন্ঠিত নহি।”

হিরণ্যকশিপুর এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দর্শনে, ব্রহ্মা কহিলেন “বৎস! দুঃখিত হইও না, তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই প্রদান করিলাম, এক্ষণে আমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এই

দুষ্কর তপঃকার্য্য পরিহার করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন কর।”
ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুও অভিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বরাজ্যে প্রত্যা— করিলেন।

২

স্বর্গরাজ্যে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত। দেবরাজ সিংহাসনচ্যুত। বৈজয়ন্তী হতশ্রী। যে নন্দনে নিত্য জ্যোৎস্না বিরাজিত, আজি তথায় অন্ধকারের রাজত্ব, যে স্বর্গ মন্দারসৌরভে প্রতি নিয়ত সুরভিত, তথায় ভীষণ ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধ বিশেষে পরিপূর্ণ। যথায় মেনকা, রম্ভা ও উর্ব্বশী প্রভৃতি চিরযৌবনা বিদ্যাধরীগণের কলকণ্ঠে ও মধুর মঞ্জিরধ্বনি ধ্বনিত হইত, তথায় এখন দৈত্যগণের শ্রবণভৈরব রবে দিবারজনী শব্দিত, দেবনদী মন্দাকিনীরও আর সে ভাব নাই, সেই প্রাণ মন মুগ্ধকারী হিল্লোল, সেই স্বচ্ছ সলীলে স্বর্ণ মৃণালে রক্তরাজীব, সে সকলের কিছুই নাই। অমরাবতী ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ। মধ্যে মধ্যে কি এক প্রকার বিভীষিকাময়ী অস্পষ্ট নীলালোক উদ্ভাসিত হওয়াতে অমরাবতী আরও বিভীষিকাময়ী বলিয়া বোধ হইতেছে। দিবা রজনীর কোন প্রার্থক্য নাই। চন্দ্র সূর্য্য নিষ্প্রভ। দেবগণ সর্ব্ববিভবে সর্ব্বতোভাবে অধিকারশূন্য। ম্লানমুখে দেবগণ বিষাদিত অন্তরে গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত! সেই শোচনীয় দশা অবলোকনে পাষাণও বিগলিত হয়।

এক অতি বিস্তীর্ণ অরণ্যে, শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া দৈত্য-

বিতাড়িত দেবেন্দ্র, বামগণ্ডে করতল স্থাপন পূর্ব্বক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। দৈত্যভয়ভীত দেবগণ শঙ্কাকুলিত হৃদয়ে উপস্থিত-বিপদের প্রতিবিধানার্থ চিন্তিত। উপায় উদ্ভাবিত হইল—দেবগণ ইন্দ্রকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করত দৈত্যগণের অত্যাচার ও দেবগণের দুর্দ্দশার সবিস্তার বর্ণন করিলেন। ব্রহ্মা, দৈত্যগণের অত্যাচার ও স্বর্গরাজ্য অধিকার বার্ত্তা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, নিতান্ত ক্ষুন্নমনে কহিলেন, "দেবগণ! আমিই এই অনর্থের মূল কারণ। আমার জন্যই তোমাদিগের এ দুর্দ্দশা। পরন্তু ঐ দুর্দ্দশার দূরীকরণ আমার সাধ্যাতীত। এক্ষণে উৎকণ্ঠা পরিহার করিয়া তোমরা বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট গমন কর। তিনিই তোমাদিগের সকল বিপদের শান্তি বিধান করিবেন। তোমরা চিন্তিত হইও না নিশ্চিন্তে আমার পরামর্শের অনুসরণ কর, অচিরেই তোমরা নিরাপদ হইবে।" দেবগণ, ব্রহ্মার বাক্যানুসারে বিষ্ণু-সমীপে গমন ও উপস্থিত-বিপদ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে, তিনি দেবগণকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় করিলেন। এবং তাঁহাদিগের বিপদ নিবারকরণ করিবার জন্য যথা বিধি উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

৩

দৈত্যপুরী আজি আনন্দকোলাহলে পূর্ণ। চতুর্দ্দিকে বাদিত্র-ধ্বনি হইতেছে, দৈত্যকামিনীগণ বহুবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যে রত হইয়াছে। দৈত্যরাজের আদেশানুসারে দৈত্যগণ মুক্তহস্তে বিতরণ কার্য্যে ব্যাপৃত। অভ্যাগত, আগন্তুক ও আত্মীয়গণের কোলাহলে রাজপুরী পরিপূর্ণ। ভীমমূর্ত্তি দৈত্যগণ দেবগণকে বিত্রাসিত করিয়া বিবিধায়ুধ হস্তে ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে। হিরণ্যকশিপুর আনন্দের সীমা নাই। আজি মহারাজের একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অঙ্গজ্যোতিতে কুমার সূতিকাগার পূর্ণ করিবা ধাত্রী অঙ্কে ক্রীড়াকরিতেছে। মহারাজ আনন্দে অধীর হইয়া মহিষী ও কুমারের ভূয়সী প্রশংসা-বাদ করিতেছেন।

কুমার দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া অঙ্গজ্যোতিতে দৈত্যবংশের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠ মাস অতীত হইলে কুমারের নামকরণ হইল। কুমার প্রসূত হইলে মহা-রাজের বড়ই আহ্লাদ হইয়াছিল, এ জন্য কুমারের নাম প্রহ্লাদ রাখা হইল। প্রহ্লাদ ভ্রাতাগণের সহিত দৈত্যরাজ্যের নিভৃত প্রদেশে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদের বয়স, বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী হই-য়াছে দেখিয়া, ষণ্ডামর্কনামধেয় রাজপণ্ডিতদ্বয়ের হস্তে কুমারের বিদ্যাশিক্ষার ভারার্পণ করিলেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্য নন্দন ষণ্ডামর্ক বিদ্যায় দ্বৈপায়ন তুল্য; শিক্ষাকল্পব্যাকরণজ্যোতিষ প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রবিষয়ে উভয়েই পিতার অনুরূপ ছিলেন।

সেই পরমপণ্ডিত শিক্ষকদ্বয় প্রহ্লাদের শিক্ষাভার প্রাপ্ত হইলেন। প্রহ্লাদ, শিক্ষার্থী বালকগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। যণ্ডামর্ক প্রহ্লাদকে সযত্নে শিক্ষাদান করিয়াও, অন্য বিষয়ের জন্য তাঁহাদিগকে বিষম শঙ্কিত হইতে হইল। যে হরিনাম দৈত্যগণের নিকট বিষম ঘৃণার্হ, প্রহ্লাদ দিবারজনী সেই হরিনাম উচ্চারণ করেন। শিক্ষক প্রহ্লাদকে যে শিক্ষাদান করেন, অত্যাশ্চর্য্য স্মরণশক্তিবলে প্রহ্লাদ অবিলম্বেই তাহা অভ্যস্থ করেন, কিন্তু হইলে কি হইবে, প্রহ্লাদ কোন প্রকারেই হরিনাম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। যণ্ড কত বুঝাইলেন, কত ভয় প্রদর্শন করিলেন, পরিশেষে কত প্রহার করিলেন, তথাপি প্রহ্লাদ হরিনাম পরিহার করিলেন না। যণ্ড বিষম বিপদগ্রস্ত হইলেন। দৈত্যরাজসমীপে এ সংবাদ উপস্থিত হইলে যণ্ডামর্কের জীবন বিষম বিপন্ন হইবে, হয়ত তিনি মনে করিবেন, যণ্ডামর্কই এই শিক্ষার শিক্ষক। যণ্ডামর্কের রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, আহার করিতে বসিলে আচমন ভুলিয়া যান, সন্ধ্যাহ্নিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে গিয়া বলির মন্ত্র উচ্চারণ করেন! চক্ষুর সম্মুখে মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী ছায়া দর্শনে আতঙ্কে কম্পিত হন।

প্রহ্লাদকে লইয়া যণ্ডামর্ক বিষম বিপন্ন হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিয়া প্রহ্লাদ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় হিরণ্যকশিপুর নিকট জ্ঞাপন করিলেন। শ্রবণ মাত্রেই হিরণ্যকশিপু বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন, মহারাজের আদেশানুসারে প্রহ্লাদকে সভাস্থলে আনয়ন করাইলেন। হিরণ্যকশিপু স্নেহভরে কহিলেন "বৎস! তুমি নাকি সর্ব্বদা আমার পরম শত্রুর নাম উচ্চারণ কর? তুমি

যোগ্যপুত্র, তোমা কর্তৃক আমার অসন্তোষ উৎপাদন, কোন ক্রমেই সম্ভবে না, তবে যদি বাল্য চাপল্যে অজ্ঞানতা বশতঃ সেই অপবিত্র শত্রুনাম উচ্চারণ করিয়া থাক, সে অপরাধ ক্ষমা করিলাম। কিন্তু সাবধান প্রহ্লাদ, সে পাপনাম আর যেন মুখে আনিও না।" পিতৃবাক্য শ্রবণে প্রহ্লাদ কহিলেন "পিতঃ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, উত্তম, কিন্তু কোন্ প্রাণে সেই পরম পবিত্র হরিনাম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেছেন? যে নাম স্মরণে মনের মালিন্য দূর হয় যে নাম সাধনে বিনা তপস্যায় জীব মোক্ষধামে গমন করে, সেই পবিত্র হরিনাম কিরূপে পরিত্যাগ করিব পিতা? পিতঃ! যে নাম প্রহ্লাদের প্রাণ, যে নাম প্রহ্লাদের জীবন, যে নাম প্রহ্লাদের দেহ, যে নাম প্রহ্লাদের শোণিত সে নাম পরিত্যাগ করিলে প্রহ্লাদ কি জিবীত থাকিবে? কেন পিতা সন্তানের মৃত্যুকামনা করেন?" হিরণ্যকশিপু ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন "দৈত্যাধম! আমার বাক্যে অবহেলা? পিতৃ আজ্ঞা তুচ্ছ জ্ঞান? কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নই, কুলাঙ্গার! তোর মরণই আমার প্রার্থনীয়—তুই এই ঘোর কলঙ্কিত জীবন অচিরে পরিত্যাগ কর তোর মৃত্যু যন্ত্রণা—সেই পাপাধমের নামশ্রবণ যন্ত্রণা অপেক্ষা লঘু।" হিরণ্যকশিপু নিস্তব্ধ হইলেন। চক্ষুদিয়া যেন আগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। দৈত্যরাজের তাদৃশ ভাব দর্শনে দৈত্যগণ প্রমাদ গণনা করিল, কিন্তু প্রহ্লাদের হৃদয় তাহাতে বিচলিত হইল না। যে হৃদয় হরিপ্রেমে উন্মত্ত, যে হৃদয়ে হরির পবিত্র মূর্ত্তি বিরাজিত, তথায় কি ভয় প্রবেশ করিতে পারে? প্রহ্লাদ ভক্ত চূড়ামণি, তিনি অবিচলিত চিত্তে কহি-

লেন "মৃত্যু আমার বন্ধু, আমি মৃত্যুকে ত ভয় করি না পিতা? আমার মৃত্যু—আমার অদৃষ্ট ফল প্রসব করিবে, কিন্তু আপনার গতি কি হইবে পিতা? আপনি যে জীবন হরি নিন্দায় কাটাইতে চাহেন, সেই জীবনের একবার পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি? আপনার জীবনের বিষময় পরিনাম চিন্তা করিয়া আমি বিষম চিন্তিত। বলুন পিতঃ—একবার বলুন—সেই পরম পবিত্র হরিনাম! এক বার সেই মোক্ষলাভের সেতু হরিনাম উচ্চারণ করুন। যে নাম বৃক্ষ শাখায়, লতায় পাতায় সুধা-ময় অক্ষয়অক্ষরে লিখিত, যে মূর্ত্তি ফলে—ফুলে, অনিলে—অনলে, কন্দরে—সৈকতে, তটে—মরুভূতে, শ্মশানে—মশানে, জড়ে—চৈতন্যে, ভূতলে—বিমানে, জীবের প্রাণে, রোগে—ভোগে, শোকে—বৈরাগ্যে, বিপদে—সম্পদে পদে পদে বিরাজিত থাকিয়া ভক্তের রক্ষা সাধন করেন, যে মূর্ত্তি ভক্তের অন্তরে নিরন্তর বিরাজিত থাকিয়া, ভক্তের হৃদয় কন্দরে পবিত্র শান্তির স্রোতস্বতী বহাইতেছেন; সেই মোক্ষলাভের কারণ-স্বরূপ বিশ্বরূপ হরির চরণ চিন্তা করুন পিতা? পুত্রের কথা রাখুন পিতা?" মন্ত্রি!—বজ্রগম্ভীরে দৈত্যগণের হৃদয় আকুলিত করিয়া হিরণ্যকশিপু কহিলেন "মন্ত্রি! কুলাঙ্গারকে বন্ধন করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ কর। শত্রু—প্রহ্লাদ আমার পরম শত্রু—সত্বর শত্রুমুণ্ড দর্শন করিতে চাই?" পুত্রঘাতী রাজাজ্ঞা রাজপুরের অন্তরে বাহিরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সকলকে এককালে ভীত ও স্তম্ভিত করিল। প্রহ্লাদ তথাপি বিচলিত হইলেন না। প্রহ্লাদ তখন ও অচল—অটল। পিতার চরণ ধারণ করিয়া কহিলেন "পিতা! জন্মের মত চলিলাম পিতা,

একবার বল সেই নাম, একবার শুনে যাই পিতা বল সেই নাম, যাবে মোক্ষধাম, নিত্যধামে করিবে বসতি। সূত্রপাত কর পিতা তার, বলবল বল পিতা হরি হরি হরিনাম সুধার ভাণ্ডার। একবার শুনি, ওই সুধামাখা বাণী, যুড়াই শ্রবণ। আহা! কি পবিত্র নাম, বলি অবিরাম, তথাপি পূরে না প্রাণের পিপাসা। হরি হরি, দয়াল হরি, কৃপা করি রাখ আসি প্রাণ, দেহ আসি পিতায় আমার জ্ঞানচক্ষু দান, পূরাও ভক্তের আশা! বিষম পরীক্ষা, নামে দীক্ষা করি হে পিতায়, দয়াময়! রাখ হে দয়াল নাম বিশ্বের মাঝারে; যুক্তকরে করি হে কামনা, ফে'ল না পিতায় ঘোর বিপদসাগরে।" প্রহ্লাদ হরি প্রেমে উন্মত্ত, সেই পরম পবিত্র নাম উচ্চারণে হৃদয় আকুলিত হইল, চক্ষে জলধারা বহিল। হিরণ্যকশিপু উত্তর করিলেন না, নয়নের ইঙ্গিতে জল্লাদগণ প্রহ্লাদেব হস্ত বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। সেই কুসুমকোমল হস্ত কঠিন রজ্জুবন্ধনে ব্যথিত হইল, অজস্র শোণিত স্রাব হইতে লাগিল, ঘাতুকগণের প্রাণ কি মমতা শূন্য!

৪

শ্মশান ক্ষেত্র! মৃতদেহবাহি বংশ দণ্ড, মৃণ্ময় কলস, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড ইত্যাদি চারিদিকে বিস্তৃত! শত শত নরকপাল ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত! শৃগাল, কুক্কুর, শকুনী, গৃধিনী প্রভৃতি শ্মশানচরগণ, চিৎকার ও উৎকট কোলাহলে দিকসমূহ আকুলিত করিয়া, বিকটরঙ্গে বিহার করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ঘাতুকগণের মনেও শঙ্কা উপস্থিত হইল,

কিন্তু প্রহ্লাদ নিঃশঙ্ক—নিশ্চিন্ত। ঘাতুক কহিল "রাজকুমার! এত অল্পবয়সে কোন প্রাণে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়াছ? এখনও আমাদিগের কথা রাখ, ও পাপনাম পরিত্যাগ কর, যাহাতে মহারাজ সন্তুষ্ট হন, এবং তুমিও যাহাতে নির্ব্বিবাদে রাজভোগে থাকিতে পাও, তাহারই বিধান কর। একটা তুচ্ছ নামের জন্য, নিজের অমূল্যপ্রাণ কি জন্য পরিত্যাগ করিবে? আমরা জল্লাদ; এই হস্তে কতশত জীবের যে জীবন হরণ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই, পাপে পাপে, প্রাণ পাষাণে গাথিয়াছে, কিন্তু, তথাপি তোমার গাত্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে হৃদয়ে দারুণ শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। কুমার! সে নাম অন্তর হইতে অন্তরিত কর, চল, আমরা মহারাজের চরণে ধরিয়া তোমার জীবন ভিক্ষা করিব।" প্রহ্লাদ হাস্য করিয়া কহিলেন "সে কি ভাই! সে নাম কি কখনও ভুলিবার। সে নামের বিনিময়ে আমার জীবন যে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ! সে অতুল্য হরিনাম পরিহার করিয়া তুচ্ছ জীবনে ফল কি ঘাতুক? ঘাতুক! সে নাম যদি ভুলিব, তবে আর রহিবে কি? তবে আর থাকিবে কি? হরি আমার প্রাণ, হরি আমার জীবন, হরি আমার পিতা, হরি আমার মাতা, তিনি যে আমার সব, তবে কেমন করিয়া সে নাম ভুলিব? ঘাতুক! তোদের প্রাণ কি সে নাম চায় না, তোদের জিহ্বা কি সে পবিত্রনাম উচ্চারণ করিতে অক্ষম? তবে কেন সে সুধানামে বঞ্চিত আছিস্? বল্‌দেখি ভাই "হরি বোল। হরি হরি বোল!" তোর মনের অন্ধকার বিদূরিত হইবে, ইহকালের সকল পাপরাশি হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হয়ে পুলকে গোলকধামে যাবি। বল্‌দেখি ভাই হরিবোল।

ভাবদেখি—পরেন পীতধড়া, মস্তকে মোহন চূড়া, করে মোহন বাসরী, চরণে মধুর মঞ্জরী, নবঘনশ্যাম শ্যামরূপ ভাবনা কররে ভাই!" জল্লাদগণ প্রহ্লাদের সমস্ত কথা গুলি, একে একে শ্রবণ করিল, একে একে একবার প্রাণ খুলিয়া গাইল হরি-বোল" দুইজনে একত্রে গাহিল "হরিবোল" তিনজনে চারি জনে পরিশেষে জল্লাদগণ প্রহ্লাদকে বেষ্টন করিয়া, হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া সকলে উভরোলে গাহিতে লাগিল, "হরি-হরিবোল!"

প্রহ্লাদরে! এ কি দেখালি ভাই? এ কি শুনালি ভাই? এমন মনমুগ্ধকারী রূপ, এমন ভুবনমোহন স্বর, কোথায়ও ত দেখিনাই ভাই? শতশত প্রাণীর প্রাণান্ত কালেও ত প্রাণ এমন আকুলিত হয় নাই ভাই? আজ তোর কথায় প্রহ্লাদ, আমাদের এ কি ভাব হইল রে? প্রহ্লাদ! তুই রাজকুমার; আমরা তোর চরণাশ্রিত ভৃত্য, আজ তোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম: দেখা ভাই তোর হরি কোথা? বল ঐ সুধাকণ্ঠে মধুরস্বরে বল ভাই—হরিবোল!

প্রহ্লাদ তখন মুদ্রিতনেত্রে শ্মশানক্ষেত্রে বসিলেন, ক্ষণেক সেই প্রাণময় মধুসূদনের মধুরমূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তে তখনি উঠিয়া উদ্ধবাহু নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ আত্মহরা বিভোর হৃদয়ে নাচিতে নাচিতে গাহিতেছেন "হরি-বোল! হরিবোল! হরি হরি হরিবোল!!!

সংবাদ রাজসভায় রাষ্ট্র হইল, জল্লাদগণ বৈষ্ণব হইয়াছে, আর তাহারা স্বকার্য্য করিবে না, সকলের মুখেই কেবল "হরি-হরি" বুলি; তাহারা প্রহ্লাদের মস্তকচ্ছেদন করে নাই, প্রহ্লা-দের সঙ্গে হরিনামে মাতিয়া শ্মশানে সকলে মিলিয়া নৃত্য করি-

তেছে। সংবাদ শ্রবণমাত্রেই দৈত্যরাজের ক্রোধের সীমা রহিল না। অবিলম্বে নূতন ঘাতুক নিযুক্ত হইল। অত্যুচ্চ পর্ব্বতচূড়া হইতে গভীর সাগরের অতলতলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহারা প্রহ্লাদের মৃত্যুসাধন করিবে!! মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য হিরণ্যকশিপু উৎকর্ণ রহিলেন। নূতন ঘাতুক প্রহ্লাদকে বন্ধন করিয়া পর্ব্বতোদ্দেশে লইয়া চলিল। প্রহ্লাদ পূর্ব্ববৎ হৃষ্টমনে ঘাতুকের অনুগমন করিতে লাগিলেন। হৃদয় যাহার কৃষ্ণময় - জগতে তাহার কিসের ভয়?

৫

জলধির আজি একি বেশ? তরঙ্গের উপর তরঙ্গ চলিয়াছে, প্রবল বায়ুর তাড়নে জলনিধি তীর আক্রম করিয়া সবলে বারিরাশি বেলাভূমীর উপর উৎক্ষেপ প্রক্ষেপ করিতেছে। তীর-প্রদেশে শ্বেতবর্ণ ফেণপুঞ্জ লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে। পর্ব্বত জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া, আকাশ ভেদ করিতেছে। বারিরাশি সেই পর্ব্বতমূলে গিয়া নিজের ক্ষুদ্রতা প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন গড়াইয়া পড়িতেছে। ঘাতুক এই পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গে প্রহ্লাদকে তুলিয়া লইল। ইচ্ছা - সেই উচ্চশৃঙ্গ হইতে রাজপুত্রকে গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। প্রহ্লাদ তরঙ্গের ভঙ্গি দর্শনে মোহিত হইলেন, আনন্দে হৃদয়ানন্দ হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদের হৃদয় কুসুমকোমল, সংসারের ভীষণ চিত্র তাঁহার চিত্তে ধারণা হয় না, তাই সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গি দর্শনে মনে মনে ভাবিলেন "প্রভু আমার এই সমুদ্র-শয্যায়

বটপত্রে ভাসিয়া ছিলেন। আহা! নাজানি এই বিষম তরঙ্গাঘাতে প্রভুর শরীরে কত যাতনাই উপস্থিত হইয়াছিল। হরি! আমার এই সংসারকারণ, কারণজলে কুতূহলে ভাসিয়াছিলেন, তরঙ্গাঘাত, বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছিলেন। আহা! সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম অঙ্গ, তরঙ্গে তরঙ্গে কত যন্ত্রনাই সহিয়াছে! অকুল সাগরে, হরি আমার ভক্তের পরিত্রাণের জন্য, স্বীয় দেহ অকুলে ভাসাইয়াছিলেন।" প্রভুর যন্ত্রণা স্মরণ করিয়া প্রহ্লাদের চক্ষে জলধারা বহিল।

ঘাতুকের আর সহ্য হয় না, বিলম্ব করিতে পারে না, দারুণ পরুষকণ্ঠে কহিল "রাজকুমার! বৃথা সময় নষ্ট করিও না। তুমি ত মরিতেই বসিয়াছ, আর আমাদের কেন মারিবে? তোমার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণের জন্য, মহারাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন, সে সংবাদ প্রদানে বিলম্ব ঘটিলে, আমার জীবনও অবিলম্বে নষ্ট হইবে, প্রস্তুত হও।" প্রহ্লাদ সস্নেহে কহিলেন "ঘাতুক! আর আমার বিলম্ব নাই, পিতাকে বলিও. প্রহ্লাদ মনের আনন্দে হরি নাম স্মরণ করিতে করিতে, জন্মের মত বিদায় হইল। আমি পাতকি! পিতার চরণ দর্শন করিতে পাইলাম না, উদ্দেশে প্রণাম করি, অভাগার প্রণাম গ্রহণ করিতে বলিও।" প্রহ্লাদ, তখন করযোড়ে কহিলেন "কোথা হে বিপদবন্ধু অনাথনাথ! কোথা হে দীনবন্ধু কৃপানাথ! প্রহ্লাদকে গ্রহণ কর হরি? হরিহে! প্রহ্লাদকে ধারণ কর হরি?" প্রহ্লাদ ঘাতুককে কহিলেন, "ঘাতুক! আমি তোমাদের রাজপুত্র, আমার একটী অনুরোধ, একটী শেষ অনুরোধ রাখ ভাই, একবার আমার সঙ্গে বল ভাই—"হরিবোল—হরিবোল।" এক-

বার ভাই হরিবোল বল!” রাজকুমার! ঘাতুক কহিল “রাজকুমার! সে নাম উচ্চারণে কি ফল?” “ফল অনন্ত, সে ফলের তুলনা নাই, সে ফলের অন্ত নাই; সে নাম স্মরণে তোর পাষাণপ্রাণ কুসুমকোমল হবে, তোর জীবন-মরুভূমে শান্তিসরসী প্রবাহিত হবে, তোর অন্ধকার হৃদয়াকাশে, সুখশশাঙ্কের উদয় হবে, তোর অন্তর্দাহ অন্তর্হিত হয়ে অন্তরে বিমলানন্দের হিল্লোল উঠিবে—এমন গুণ যে নামে, এমন শক্তি যে নামে, সে নাম একবার উচ্চারণ কর ভাই?” ঘাতুক কহিল, “হইতেও পারে” তাহার মন ফিরিল, হরিনাম শ্রবণে সে আত্মহারা হইল, হৃদয়ের ভবিষ্য ও বর্ত্তমান ভাব, পরস্পর সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া একটু বিহ্বল হইয়া পড়িল!

“আহা! পাপাত্মা আমি, প্রভুকে কত কষ্টই দিতেছি। একটী তুচ্ছ প্রাণীর প্রাণ রক্ষায় প্রভু আমার বারম্বার, কত অত্যাচারই সহ্য করিতেছেন। আমি ত কেবল একক নহি, তাঁহার যে জগত; এই বিশ্বের সমস্ত প্রাণী যে তাঁহার চরণাশ্রিত? তবে আমার জন্য তিনি এত কষ্ট কেন স্বীকার করিবেন? কিন্তু আমার যে আরকেহই নাই! হরি তুমিই যে আমার সব, তুমিই যে আমার জীবন, তুমিই যে আমার সাধনের ধন, তবে এখনও গ্রহণে বিরত কেন? হরি হে! ধর দাসে, রাখ দাসে যুগল চরণে--হরিবোল! হরিবোল!” তখন প্রহ্লাদঘাতুকে একত্রে মুক্তকণ্ঠে সমস্বরে পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিলেন “হরি বোল” সে শব্দ সমুদ্রের তীরে তীরে প্রতিধ্বনিত হইয়া গাইল “হরিবোল।” প্রহ্লাদ হৃষ্টমনে হরিময় প্রাণে হরি বোল বলিতে বলিতে অগাধ সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন। ঘাতুকের সন্দেহ বিষম সন্দেহ

উপস্থিত হইল। তাহার পাষাণহৃদয় বিপর্য্যস্ত, ধারণা বিধ্বস্ত হইয়াগেল, হৃদয়ে নিঃশব্দে শোকের প্রবাহ বহিল। সে অজ্ঞাতে উচ্চারণ করিল "হায়! কি করিলাম কি হইল। হরি, হরি, কি করিলে?" হরি হরি! ঘাতুক দেখিল একি? হরি হরি! প্রহ্লাদ ডুবিল কৈ? প্রহ্লাদের দেহ মগ্ন হইল কৈ? কে যেন অঙ্ক পাতিয়া ধারণ। করিল. একি? প্রহ্লাদ বারিধি অঙ্কে সুখপর্য্যঙ্কে সুখাসনে আসীন আছেন, বিশাল-বারিধি-অনন্তাকাশ ভেদ করিয়া সুধাময় মধুরকণ্ঠধ্বনি গাহিতেছে "হরিবোল" প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে "হরিবোল, হরিবোল।" সেই শব্দ সেই সুদূর নিম্নে প্রহ্লাদের কর্ণে ধ্বনিত হইল। সেই সাগর-সলিলে কুতু-হলে ভাসমান প্রহ্লাদ প্রহৃষ্ট মনে কহিলেন "ভয় নাই ভাই, ভয় নাই। আমি শ্রীহরির কোমলক্রোড়ে পতিত হইয়াছি। বল ভাই হরিবোল।" ঘাতুক, সানন্দে সন্দেহশূন্যহৃদয়ে গাহিল "হরি বোল।" প্রহ্লাদ সমুদ্রসলিলে হরিনাম বলে নিস্তার পাইলেন। কি এক মোহিনীশক্তিবলে কূলে উঠিয়া প্রহ্লাদ ঘাতুকের সহিত সম্মিলিত হইলেন। দুই জনেই হরি প্রেমে উন্মত্ত, উভয়ে উভয়কে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঘাতুকের কঙ্করময় হৃদয়-মরুভূমে সহসা শান্তিসরসীর আবির্ভাব হইল। ঘাতুক কহিল, "ভাই! আর আমি রাজধানী যাইব না, কেন মহারাজের রোষ-বহ্নিতে পতঙ্গ তুল্য বিনষ্ট হইব? তুমি যে নাম আমাকে শিখা-ইয়াছ. যে মূর্ত্তি আমার পাষাণহৃদয়ে চিত্রিত করিয়াছ, সেই হরি নাম গাহিয়া হরি-স্মরণ করিয়া জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিব। রাজকুমার! তুমি রাজধানীতে প্রতিগমন কর। আমার আর সাক্ষাৎ পাইবে না, তুমি আমার শিক্ষাদাতা, দীক্ষাদাতা,

তোমার পদধূলী আমাকে সর্ব্বত্র কুশলে রাখিবে।" প্রহ্লাদ আবার মধুরতানে হরিগুণগানে ঘাতুককে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিলেন।

মহারাজ এ সংবাদে বিস্মিত না হইয়া আরও প্রজ্বলিত হইলেন। ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া তিব্রকণ্ঠে কহিলেন "আশ্চর্য্য! একটা বালকের প্রাণবধ করিতে এত চেষ্টা এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইল? এ লজ্জা রাখিবার আর স্থান নাই। মন্ত্রি! আমার আজ্ঞায়, প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। সাবধান! সতর্কে সন্তর্পণে কার্য্য সমাধা করিবে। এ কার্য্যে যথেষ্ট পুরস্কারের আশা রহিল। অন্যথা, তোমার জীবন বিপন্ন হইবারও সম্পূর্ণ আশঙ্কা, সত্বর কার্য্যশেষ কর, অবিলম্বে যাও।" মন্ত্রি রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রস্থান করিল। প্রহ্লাদ পুনর্বার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। যাহার হৃদয়কারাগারে শ্রীহরি বন্দি, তাহাকে কি তুচ্ছ কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়? শ্রীহরি যে দেহের প্রহরী, সে দেহের কি ক্ষয় আছে?

— —

৬

ধূ-ধূ অগ্নি জ্বলিতেছে! অগ্নিশিখা জিহ্বা প্রসারণ করিয়া জগতকে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে! চিতাবহ্নির কুণ্ডলিত ধূমপুঞ্জ চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া শূন্যে সমুত্থিত হইতেছে। ঘৃত সংযুক্ত বহ্নি প্রজ্জ্বলিত—সম্মুখে বন্ধনাবস্থায় প্রহ্লাদ দণ্ডায়মান; রক্ষীবর্গ দারুণ সতর্কতার সহিত চারিদিক রক্ষা করিতেছে—পাছে প্রহ্লাদ পলায়ন করে। বদি

প্রহ্লাদ পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করে, তবে তাহাদিগের জীবন নিশ্চয়ই বিপন্ন হইবে। সেইজন্য প্রতি বায়ুহিল্লোলে প্রতিপলকে তাহারা প্রহ্লাদের অগ্নিপতনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।—তাহাদিগের মুখে দৃঢ়তার পূর্ণবিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু প্রহ্লাদের তদানিন্তন ভাব দর্শন করিয়া রক্ষীবর্গ কিছুই বলিতে পারিতেছে না। প্রহ্লাদ একমনে নির্নিমেষ নয়নে, সেই সর্ব্বভুকের প্রতি চাহিয়া আছেন। মুখে কথা নাই, শরীরে স্পন্দন নাই, যেন চিত্রিত পুত্তলি! কিয়ৎকাল পরে প্রহ্লাদ কহিলেন, "একি প্রভু! একি বেশ তোমার! প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে স্থান দিতে আজ একি বেশ ধারণ করেছ হরি? হরি! আতঙ্গে মরি, পরিহরি বুঝিবা জীবন, শ্যামবরণ! কি কারণে হেন, সংহার মুরতি আজ করেছ ধারণ? বিশ্বময়! রাখ মোরে, দুস্তরে, নিস্তার কর হরি? হরি হে! দিনবন্ধু! কৃপাসিন্ধু! সিন্ধুহতে করিলে নিস্তার, আজি অগ্নিমাঝে, সেই সাজে, কর আসি পার। হরি! একি বেশ! একিবেশ প্রভু! কেন এবেশ হরি? এ অগ্নিমাঝে অগ্নিতেজ—জড়িত অগ্নিময়বেশ, কেন হৃষিকেশ? এস হরি, অগ্নি পরিহরি হৃদয় আসনে? এস হরি! দর্শন করি, মোহন মাধুরী; সম্বরি হৃদয় বেদন? প্রাণধন! সাজে কি তোমার হেন বেশ? হরি? হরি? কৈ হরি, প্রাণহরি জীবন হরি, কৈ তুমি হরি? হৃদয় আসনে এস হরি, মনের বেদন জুড়াও হরি, দাসকে ক্রোড়ে ধারণ কর হরি, হৃষিকেশ? ত্যাজ হেন বেশ, পর পীতধড়া—মোহন চুড়া করহে ধারণ? শ্যামবরণ! পর বনমালা জুড়াই জ্বালা করি দরশন। দুঃখ মরু-ভূমে প্রাণ যায় হরি? দয়ার সাগর হরি কৃপাকরি কৃপাবারি-

দানে, মরুভূমে স্রোতস্বতী বহাও জীবনে। পিতা বাম, গুণধাম, তোমার লাগিয়া ; দাও হে সুমতী, কর গতি পিতায় আসিয়া, যেই মুখে মনসুখে তব নিন্দাগান গান তিনি সদা, পড়িবে কি বাধা মুক্তির সোপানে ? রক্ষা কর, হরি, পিতারজীবন। হা পিতা ,—কোথা তুমি পিতা, জগত পিতায় করি দরশন—জুড়াও জীবন—

ঘাতুক বজ্র গম্ভীরে কহিল "রাজকুমার ! প্রলাপ পরিত্যাগ কর। অবিলম্বে প্রস্তুত হও।" "কেন ভাই—এমন কঠিন বাবহার ?"প্রহ্লাদ ঘাতুককে কহিলেন "কেন ভাই ! তোমার এমন ব্যবহার ? আর ত সময় চাহিব না, আর ত এমন ভাবে এ ভাবনা ভাবিব না ; আর ত তোমার নিকট সময় ভিক্ষা করিব না ভাই, তবে কেন তোমার এমন ব্যবহার ? ঘাতুক ! তোমার পায়ে ধরি—ভিক্ষা করি—আর একটু অপেক্ষা কর ভাই ?"ঘাতুক সম্মত হইল, প্রহ্লাদ আবার সেই চিতার দিকে চাহিলেন, সবিস্ময়ে কহিলেন "কৈ প্রভু ! কোথা তুমি ? কোথায় লুকালে অকুলে ভাসায়ে দাসে ? জীবন প্রদানে, অসমর্থ জেনে, অভিমানে লুকালে কি হরি ? পায়ে ধরি হরি, ভিক্ষা করি ;—দেখাও সে রূপ বিশ্বরূপ ; মনসুখে সর্ব্বভূকে পড়িব এখনি। হায় ক্ষীতি ! রক্ষিতে বক্ষেতে ধরি যাহারে সদত, পাপময় পদচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া কত যে সহেছ ভার কব তা কেমনে ? মনে মনে নাহি ভাবি তাহা—বিদায় মোরে দাও এইক্ষণে। জগতজীবন তুমি, বহেছিলে এতদিন যাহার শরীরে, অচিরে সংহর তারে এই আকিঞ্চন। সমীরণ ! পরিহরি এছার জীবন—বিদায় দাও হে মোরে। তাপ ! যে তাপে তাপিত তনু ; কে সন্তাপে সন্তাপিত

এ পোড়া পরাণি, নাহি জানি কিসে পরিত্রাণ, প্রাণ ত্যজি জুড়াব হে প্রাণ। লইনু বিদায়, সদয় হইয়ে, করুণা করিয়ে, পরিত্যাগ কর এ শরীর হা সমীর! নিরন্তর হরিগুণ কথা, হরি-গুণ গাথা শুনাতে এ জনে, এ জীবনে আর না শুনিব সেই নাম; সুধানাম ঝরে অবিরাম সুধা, শ্রবণক্ষুধা না মেটে কখন। যাও হে প্রাণ! ছাড়ি এ জীবন, জীবন উৎসর্গকরি শ্রীহরির পায়। কোথা দয়াময়; অনন্ত, অনন্ত তুমি; আকাশে প্রকাশে তব অনন্ত মহিমা, নাহি সীমা মিলিত হয়েছে যাহা দিগ দিগ-ন্তরে, অন্তরে—সদত যাঁরে করিহে কামনা, তিনিই তোমার মত অনন্ত মহিম। নিরদবরণ! নিরদবরণে, পড়ে মনে দর্শনে তোমারে। বিদায় আমারে দাও ত্বরা। নয়ন! নবঘনশ্যামরূপ করি দরশন পূরিত না আশ, পীতবাসে মনের আবেশে করি দরশন, জুড়াত সকল জ্বালা; আজ জলনে জুড়াব জ্বালা করিছি মনন। শ্রবণ! যে নাম শ্রবণে; মনে মনে, কত যে সুখস্বপন উঠিত যাগিয়া, নাহি পারি আর শুনিতে সে সুধামাখা বাণী; সুধামাখা হরিনাম, অবিরাম পশিত শ্রবণে, আনন্দলহরী কত উঠিত যে হৃদয় মাঝারে কব তা কাহারে? কিন্তু হায়, মায়াময় বিশ্বের মাঝারে ভাঙ্গিলরে অন্তরের সুখের স্বপন, শ্রবণ, শ্রবণ কর সুধাহরিনাম জনমের তরে, না পারিবে আর পুনঃ, ত্যজ সে বাসনা!—রসনা! যেই রসে, মনের হরিষে গাইতিস হরিনাম; অবিরাম হরি হরি বলে, কুতুহলে জুড়াতিস্ জ্বালা;—সেই নাম—সেই সুধা, হরিনাম গাওরে রসনা, পাবি না পাবি না আর পুনঃ, রস শূন্য হইবি অচিরে হায়!—নিরন্তর সেবা যাঁর করিস যতনে, যতনে হৃদয়াসনে

সং'সারে যে ধনে ভক্তিভাবে করে ক'রে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী দিস্ যে চরণে, সে চরণ কররে স্মরণ! জীবন! জীবনের জীবন যে জন, ভাব সেই নিরঞ্জন, পতিত পাবন দয়াময়ে, অসময়ে অসহায়ে রক্ষ দয়াময়, পদাশ্রয় দানে, দীন হীনে কর ত্রাণ হরি। মুরারি! বংশিধারী, শ্রীহরি, কৃপা করি দাও প্রভু চরণেতে স্থান। ঘাতুকরে, গাও ভাই হরিনাম। হরিনামে শান্তি ধামে পাবিরে আশ্রয়। নাহি ক্ষয়, নাহি অপচয় প্রেমময় তিনি।—বল ভাই হরি হরি বুলি, দেরে কর তালি, সবে মিলি গাও হরি নাম!

ঘাতুকগণ! তোদের নিকট এই আমার অন্তিম প্রার্থনা আমার মৃত্যুকালে একবার নিজ মুখে হরিনাম শুনাবি কি? আমার অন্তিমে সেই সুধা নাম একবাব ব'লবি কি রে? ঘাতুকগণ স্বীকৃত হইল।

* * * * *

* *একি? একি এ? প্রহ্লাদ আর নাই! সর্ব্বভুকের উদরে, তাহার বিশ্রাম স্থান হইয়াছে। বিষন্নবদনে পূর্ব্ব ব্যবহার পরিহার করিয়া রক্ষীবর্গ হায় হায় করিয়া উঠিল। তাহাদিগের মনে হইল, হায় কি ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিলাম! এমন দাস্যবৃত্তি অপেক্ষা ভিক্ষালব্ধ মুষ্টিমেয় অন্নও সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর! আবার একি এ? প্রহ্লাদের আজ একি বেশ? অগ্নি মাঝে ও-কি-ও? ও কে? ও কিসের মূর্ত্তি? রক্ত বর্ণ রক্তবস্ত্র পরিহিত রক্ত মুকুট শিরে কেও? প্রহ্লাদেরে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন? প্রহ্লাদের গলদেশে কুসুম মাল্য, মনোহর বেশ, ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিয়া প্রহ্লাদের চক্ষুজল মার্জ্জনা করিয়া দিতেছেন কে উনি? আহা কি মনোহর দৃশ্য। স্তব্ধ!

ধন্য তুমি, অগ্নি দেব আজ তোমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রক্ষা করিলেন। ধন্য, ধন্য তুমি !!

রক্ষীবর্গ প্রহ্লাদের তদানিন্তন ভাব দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। অগ্নিদেব অলক্ষে প্রহ্লাদকে বক্ষে ধারণ করিয়া অগ্নি হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, অভয় দান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন,—অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

৭

প্রহ্লাদের নিধনার্থ পুনরায় নূতন প্রণালী আবিষ্কৃত হইল। ষড়যন্ত্রকারীগণ একবাক্যে কহিল, এইবার আশা পূর্ণ হইবে, এবার আর প্রহ্লাদের নিস্তার নাই। প্রহ্লাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির জন্য, হস্তি—পদতলে তাহাকে নিক্ষেপ করা হইবে।

যথা সময়ে সাবদীয় জলাদাকার এক প্রমত্তবারণ সমানীত হইল। উন্মত্ত করিবর কর বিস্তার করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। মন্ত্রির আজ্ঞানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রহ্লাদ বধ্যভূমে আনীত হইলেন। হস্তি প্রহ্লাদকে দর্শনমাত্র উন্মত্তভাব পরিত্যাগ করিয়া দিব্য প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রহ্লাদকে বন্ধন মুক্ত করিয়া হস্তি—পদতলে নিক্ষেপ করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ একতানমনে বিপদনিবারণ মধুসূদন হরিকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কহিলেন দীননাথ! এই বিষম পরীক্ষায় দাসকে উদ্ধার কর। যাহার প্রাণ বারম্বার রক্ষা করিয়াছ, এই বার—আর একবার তাহার জীবন রক্ষা কর। অথবা যদি দাসের প্রাণ এই পরীক্ষা সূত্রে

স্তবণ করিয়া মোহান্ধ পিতার আমার ইহামুক্তের জন্য কোন ও মঙ্গল সাধন সম্ভবে, হরি হে! এস একবার, তবে সে পক্ষেও সুবিধান কর হরি, মঙ্গলময়! তোমাব বিশ্বের মঙ্গল যাহাতে সম্পন্ন হয়, কর হরি! বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি, একমাত্র বাঞ্ছা এই পূর্ণ কর প্রভু! একবাব তবে প্রাণান্ত সময় সেই ত্রিভুবন বাঞ্ছিত মোহন মূর্ত্তিখানি আর একবার দাসকে দেখাও হরি। হরি হে তুমি অগতির গতি, কর গতি এ মিনতি পদে।" হস্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "করিবর! তুমি আমাব মৃত্যু স্বরূপ আজি তোমার চরণতলে আমার জীবন বিনষ্ট হইবে। যাহাকে তুমি পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে, আজ সেই হতভাগ্যকে পদতলে পিষ্ট করিয়া নিধন কর। কিন্তু, একটু অপেক্ষা! এই ভিক্ষা অন্তিম সময়ে"—প্রহ্লাদ সজল নয়নে উর্দ্ধ বাহু হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

অচ্যুত কেশব, মুকুন্দমাধব,
দেবস্য দুর্ল্লভ, দয়াকর।
যোগীন্দ্র বন্দিত, যোগেশ বাঞ্ছিত,
সর্ব্ব যোগাতীত, যোগেশ্বর॥
ভবাব্ধি পারক, ভবান্ধ তারক,
সর্ব্বগুণাত্মক, গুণাকর।
নিত্যনিরাময়, সত্য সদাশয়,
ভক্তস্য আশ্রয়, ভীতিহর॥
বিশ্ব বিমোহন, বিরিঞ্চি বন্দন,

বিঘ্ন বিঘাতন, নীলাম্বর।
গোবিপ্রপালক, গোবৃন্দরক্ষক,
গোবিন্দনামক, গণেশ্বর ॥
ভবভয়ভঞ্জন, দীনজনতারণ,
গোপীগণরঞ্জন রমেশ্বর।
গীর্ব্বাণতারক, নির্ব্বাণ দায়ক,
সর্ব্ববিধায়ক, সর্ব্বেশ্বর ॥
শ্রীবিষ্ণু বামন, জিষ্ণু জনার্দ্দন,
দৈত্যবিমর্দ্দন, গতিপ্রদ।
ধর্ম্মস্য ধারক, কর্ম্মস্য কীলক,
কালভয়ান্তক, কালচ্ছদ ॥
মৃত্যুজ্বরাতীত, মৃত্যুঞ্জয়স্তুত,
মন্ত্রপতিঃ পূত, ময়ান্তক।
নীলকলেবর, নিত্যনিধীশ্বর,
চক্রীগদাধর, চিদাত্মক ॥
শান্তিশিবপ্রদ, শিবস্যসম্পদ
জাহ্নবীজন্মদ, জন্মহর।
শ্রীনন্দনন্দন, কুঞ্জবিহারণ,
মোহবেণুবাদন, পীতাম্বর ॥
কৈটভমর্দ্দন, কেশাবিঘাতন,

কংস নিসূদন, বংশীধর।
ধ্বজবজ্রাঙ্কন, কৌস্তুভ ভূষণ,
শ্রীবৎস্যলাঞ্ছন, বপুবর॥
শ্রীধর শ্রীকর, শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঙ্কর,
স্থিতিগতিসংহার, ভারধর।
বিশ্ববিকাশন, ব্রহ্ম সনাতন,
বৈকুণ্ঠশোভন, বিশ্বম্ভর॥
ত্রিতাপহারক, ত্রিগুণধারক,
ত্রিলোকতারক, ত্রাহি ত্রাহি।
ধ্যায়তি প্রহ্লাদ, প্রসীদ প্রসীদ
দীনে দুর্দ্দিনে দীনং দেহি দেহি

কৃপা কর হরি, দাও চরণতরি, পরিহরি এ পাপ জীবন। দেখাও সেরূপ, সে নবঘনশ্যামরূপ, করি দরশন, জুড়াই, জীবন-ধন। জীবন যন্ত্রণা। হরি! হরি! হরিবোল!

হস্তি নিঃশব্দে প্রহ্লাদের কারুণ্যপূর্ণ বচন শ্রবণ করিল! প্রহ্লাদ হস্তির উত্থিত পদতলে নিপতিত হইলেন। হরি হরি! মন্ত্রি অনুচরগণসহ স্তম্ভিত, সাড়া সব্দ নাই, কথা কহিবার শক্তি নাই। এক দৃষ্টে প্রহ্লাদের অলৌকিক কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন হস্তি উত্থিত পদপ্রান্ত সরাইয়া লইয়া শুণ্ডাগ্রে, অতি ধীরে ধীরে, প্রহ্লাদকে আপন পৃষ্ঠে—আরোহণ করাইল এবং সানন্দে বৃংহিত ধ্বনি করিতে করিতে

মন্থর গমনে প্রস্থান করিল। মন্ত্রির আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইল, প্রাণ বিপন্ন হইল। ক্রুদ্ধ মহারাজের চরণ ধারণ করিয়া আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য অনুমতি চাহিল। বিস্তর চেষ্টায় অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রি পুনরায় সোৎসাহে প্রহ্লাদের নিধনার্থ আয়োজন করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টায় বহু মন্ত্রণায় প্রহ্লাদকে বিষপ্রয়োগে নিধন করাই স্থিরীকৃত হইল। মন্ত্রণা—যথাবিধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, মন্ত্রি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৮

একবার দেখা দাও হরি। পামর অধম দাসকে একবার দেখা দাও প্রভু, আহা! সাধুগণ যাঁহাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পদার্থ উৎসর্গ করেন, পাতকী আমি, সেই সাধনের ধনকে হলাহল উৎসর্গ ক'চ্ছি? হা ধিক, শত ধিক পাপাত্মার জীবনে। কোন প্রাণে, হরি ধনে বিষপান করাতে উদ্যত হয়েছি? হায়! জীবন ধারণে কি এই ফল? হলাহল ইষ্টধনে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছি। এ যে উভয় সঙ্কট—একে পিতার ক্রোধজনিত আমার দারুণ দুর্গতি তাহাতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবনের গতি, এই গতিতে কি পরিণামে আমায় গতিহীন করিবে? হে দুর্গতি হারক! পরিশেষে কি বিষম দুর্গতিজালে জড়িত হয়ে জীবনের সার ধনে হারাব? হা হতভাগ্যের একি দুর্গতি? প্রভু, একবার সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, একবার সেই সুধাময় সেই মনোমোহন শ্যামমূর্ত্তি দেখাও—হরি! আমি যে কর্ত্তব্য অব-

ধারণে নিতান্তই অসমর্থ—দেখা দাও হরি! প্রহ্লাদ বিষমিশ্রিত খাদ্য সম্মুখে লইয়া অবিরল ধারে অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। যিনি দয়ার সাগর ভক্তের জীবন, ভক্তের রোদন তিনি কি সহ্য করিতে পারেন? ভক্তের বাসনা অপূর্ণ রাখা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভবে? সেই ব্রজবিহারী হরি, গোপাল রূপে প্রহ্লাদ সমীপে সমাগত এবং বিষমিশ্রিত আহার্য্য স্বয়ং গ্রহণ করিয়া প্রহ্লাদকে প্রসাদ দান করিলেন।

কহিলেন প্রহ্লাদ রে! রোদন কেন বাপ? সুখাদ্য পদার্থ সর্ব্বত্রই ত প্রাপ্ত হই, কিন্তু কোন্ ভক্ত আমার প্রতি এত নির্ভর করে? কোন ভক্ত সাহস ক'রে আমাকে বিষদানে সমর্থ হয়? প্রহ্লাদ! বিষই যে সংসারের সার, বিষেরই যে সংসার। বিষ না হইলে পীযুষের যে সারবত্তা থাকে না? কোনও চিন্তা নাই, নির্ব্বিঘ্নে খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ কর"। প্রহ্লাদ কাঁদিয়াই আকুল। কহিলেন, "দয়াময় হরি! দাসকে——"দয়াময় হরি প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন, সান্ত্বনা করিলেন। এদিকে মন্ত্রি অনুচর সহ উপস্থিত, দেখিলেন বালক গোপাল মূর্ত্তি হরি প্রহ্লাদের চক্ষুজল মুছাইয়া দিতেছেন, মন্ত্রির হৃদয় এদৃশ্যে বিমোহিত হইল। এই কারাগারে কে এ বালক প্রহ্লাদের সান্ত্বনা করে! আহার্য্য দেখিয়া বুঝিলেন, তাহার অর্দ্ধাংশ অন্তর্হিত! ভাবিলেন যাহাই হউক প্রহ্লাদের আর এবার নিস্তার নাই। মন্ত্রি সানন্দে প্রহ্লাদের মৃত্যুর অপেক্ষায় রহিলেন। গোপাল বুঝিলেন, কহিলেন"প্রহ্লাদ! কোন চিন্তা নাই, নির্ব্বিঘ্নে আহার্য্য গ্রহণ কর।"—গোপাল অন্তর্হিত হইলেন। প্রহ্লাদ অবলীলাক্রমে বিষ মিশ্রিত অন্ন উদরস্থ করিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ

ত মরিলেন না ? সেই প্রখর হলাহলে প্রহ্লাদ ত বিকৃত হইলেন না ? মন্ত্রির সকল আশা, সকল চেষ্টা বিফলীভূত করিয়া প্রহ্লাদ বিষপানেও জীবিত রহিলেন ! মন্ত্রি বিস্মিত হইলেন, প্রহ্লাদকে কহিলেন "প্রহ্লাদ ! সত্যবল, তুমি কোন্ শক্তি বলে এই অসামান্য বিপদ হইতে নিস্তার পাইতেছ ? হস্তিপদতলে, অগ্নিমাঝে, পর্ব্বত হইতে সমুদ্র নিক্ষেপে এবং অবশেষে এই প্রাণ হন্তারক বিষপানেও কিরূপে নিস্তার পাইলে ?" প্রহ্লাদ সানন্দে কহিলেন মন্ত্রি মহাশয় ! আমার মৃত্যু সেই মৃত্যুঞ্জয় রক্ষা করিয়াছেন, সেই পতিতপাবন হরি যে আমার রক্ষা কর্ত্তা ! আপনাদের যিনি রক্ষা কর্ত্তা, তাহার রক্ষাধীনে থাকিয়া আপনারা ত শমন সঙ্কটে নিস্তার পাইবেন না, কিন্তু আমি যাঁহার রক্ষাধীন শমনও তাঁহার পদানত। মন্ত্রি মহাশয় ! তুচ্ছ অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া কেন তাঁহারই অধীন হউন না, কেন সেই বিশ্বময় হরির প্রতি দেহভার সমর্পণ করুন না ?" এতক্ষণে মন্ত্রির চৈতন্য হইল। তিনি ভক্তিভরে কহিলেন "প্রহ্লাদ ! বল রে, একবার সেই হরি নামে দেহ পবিত্র হউক।" তখন মন্ত্রিবর অনুচরগণ সহ প্রহ্লাদ-প্রদত্ত হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। সেই কারাগার প্রতিধ্বনিত করিয়া সকলে সমস্বরে সুমধুর হরি নাম গাইয়া পরস্পর বিমুগ্ধ হইলেন।

এ সংবাদও মহারাজ সমীপে পৌছিল। হিরণ্যকশিপু শুনিলেন, প্রহ্লাদ মন্ত্রিকে পর্য্যন্ত হরিমন্ত্রে দীক্ষিতবকরিয়াছে। প্রহ্লাদের নিকট যে গমন করে সেই বৈষ্ণব হইয়া যায়। ক্রোধে হিরণ্যকশিপুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তিনি স্বয়ং কারাগারে উপস্থিত হইলেন। প্রহ্লাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া ভূমিতলে

পদাঘাত করিয়া কহিলেন, "প্রহ্লাদ! তুই আমার পরম শত্রু! তুই কোন সাহসে সেই পাপ মন্ত্রে দৈত্যগণকে দীক্ষিত করিতেছিস্? আমার বাক্য তুই কোন সাহসে লঙ্ঘন করিলি। আমি তোর পিতা,সে কি আমা অপেক্ষাও উচ্চ? আমাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ? যে আমাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার ভজনা করিস্!" প্রহ্লাদ কর যোড়ে বলিলেন "পিতা! আপনি আমার উচ্চ। কিন্তু তিনি যে আপনা হইতেও উচ্চ। আপনি আমার মস্তক, তিনি সেই মস্তকের উপর আকাশ। পিতা! সেই বিশ্বময়ের নিন্দা করিয়া কি জন্য পাপ বৃদ্ধি করেন? কেন হৃদয়েব শান্তিভঙ্গ করেন? একবার বলুন হরি নাম, যাবেন মোক্ষধাম, নিত্য ধামের পথিক হউন পিতা। অনুরোধ করি চরণে ধবি, হরিবোল বলুন বদনে" প্রহ্লাদ—আবার সেই নাম! সেই অপবিত্র নাম আবার উচ্চারণ? যাতে প্রাণ জ্বলে, ঘৃণার অনলে, কুতূহলে বলিস্ সে নাম?—মৃত্যু নাই তোর দুর্ম্মতি। ভাল, বল্ দেখি কে তোর কৃষ্ণ—কোথায় সে পাপাধম?" পিতা! সর্ব্বময় তিনি, সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজিত। জগতের প্রত্যেক বস্তুতে তিনি বর্ত্তমান, কোথায় তিনি নাই?"—কোথায় সে দুর্ম্মতি! দেখা দেখি কোথা তোর বিপদবারণ। জ্ঞান চক্ষু করি উন্মিলন দেখুন নয়নে।" কি? নাহি কিরে জ্ঞানচক্ষু মোর? কোথায় তোর বিশ্বময়? আছে কিরে স্ফাটিক স্তম্ভেতে? প্রহ্লাদ অবিচলিত হৃদয়ে কহিলেন "অবশ্য আছেন তিনি।" "দেখি তোর কেমন সে হরি।" মহারাজ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে স্ফাটিকস্তম্ভে সবলে তরবারি ঘাত করিলেন।

একি? একি দৃশ্য! আধ সিংহ, আধ নরাকার মূর্ত্তি কে এ স্ফাটিক স্তম্ভ হইতে নির্গত হইল? হিরণ্যকশিপুকে এক চপেটাঘাতে চক্ষুর নিমেষে কে এ বধ কল্লে? প্রচণ্ড হুঙ্কারে দৈত্যকুলকে স্তম্ভিত ক'ল্লেন কে ইনি? প্রহ্লাদ শির নত করিয়া প্রণত হইল! কে ইনি? ভগবান্ হরি,বৈকুণ্ঠবিহারিহরি, নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে, সাধক প্রহ্লাদের রক্ষা, ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত হিরণ্যকশিপুকে নিধন করিলেন। নৃসিংহ অবতারেরকার্য্যসমাধা হইল।

প্রহ্লাদ? ধন্য তুমি!—ধন্য তোমার ভক্তি! তুমি—ভক্তচূড়ামণি। কার্য্যে এমন উপদেশ—কেহ কখন দেখায় নাই। এমন ভাবে হরিনাম কেহ করে নাই। এমন ভাবে কেহ ধর্ম্মপ্রচার করে নাই। তুমি যে ভক্তিযোগ জগতে প্রদর্শন করিলে, তাহার তুলনা নাই. আমরা ভক্তিভরে তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার করি। ধার্ম্মিককে ধর্ম্ম উপদেশ দেওয়া কঠিন নহে, ধার্ম্মিক জনকে ধর্ম্ম পথে লইয়া যাওয়া কঠিন নহে, কিন্তু যাহারা ধর্ম্মদ্বেষী, যাহারা শ্রীহরির নামে কলঙ্কার্পণ করিয়া জীবন কাটাইতে চায়, যাহারা ধর্ম্মকে শত্রু জ্ঞান করে, তাহাদিগকে ধার্ম্মিক করা, তাহাদিগকে ধর্ম্মপন্থায় আনয়ন করাই মহত্ত্ব। পাপীকে ধার্ম্মিক করাই মনুষ্যত্ব? তুমি সেই ধর্ম্মকর্ম্মজ্ঞানবিরহিত দৈত্যগণের হৃদয়ে পবিত্র হরিনাম-বীজ রোপণ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিলে। যিনি নিজের মুক্তির সহিত পরের মুক্তি সংযুক্ত করিয়া, সেই মুক্তির উপায় করিতে পারেন, তিনিই দেবতা। তিনি সকলেরই নমস্য।

প্রহ্লাদ—যোগী চূড়ামণি। নিষ্কাম ভক্তিযোগ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। প্রহ্লাদ সেই নিষ্কাম-যোগী।

ফল কামনায় যাহা করা যায়, তাহা সকাম। সকাম——ফল কামনা হেতু, নিষ্কাম——কর্ত্তব্য হেতু। প্রহ্লাদ সেই নিষ্কাম-যোগী। সকাম যোগানুষ্ঠানে ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্তও লাভ করা যায়, কিন্তু নিষ্কাম যোগানুষ্ঠান ভিন্ন নির্ব্বাণমুক্তি লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। মনুষ্যের তাবত চেষ্টা, তাবত কৃতকার্য্যতা বিশ্বের হিতার্থে বিনিযুক্ত হউক, ইহাই নিষ্কাম যোগানুষ্ঠাতার মূলমন্ত্র। নিষ্কাম-যোগী যাহা করেন, তাহা সংসারের জন্য, বিশ্বের হিতার্থে, তদ্ভিন্ন তাঁহার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। যাহারা স্বীয় আত্মার নির্ব্বাণের সহিত বিশ্বের আত্মা সংযুক্ত করিয়া সেই যোগাত্মার উন্নতি কামনা করেন, তাঁহারাই নিষ্কামযোগী। বলা বহুল্য, প্রহ্লাদ এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট।

মানব যে কোন কার্য্যেরই কেন অনুষ্ঠান করুন না, তাহার সমস্তই, তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্য মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত। সৃষ্টিকর্ত্তা সংসারহিতার্থেই মানব সৃজন করেন, মানবের কর্ত্তব্য সৃষ্টির সহায়তা করা। যিনি সেই সংসারহিতার্থে নিজের যাবতীয় কার্য্য প্রযুক্ত করিতে পারেন, তিনিই নিষ্কামযোগী। প্রহ্লাদ নিষ্কামযোগীর আদর্শ। তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজের মুক্তির জন্য হরি সাধন করেন নাই, দৈত্যগণের নিস্তারের জন্য, সংসারের হিতের জন্য, হরিসাধন করিয়াছিলেন। পাঠক! নিষ্কামযোগ যোগের শ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ চরিত্র অনুকরণ করা, মানবমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

সপ্তম ভাব।

সাধনা, প্রকার ভেদে দুই প্রকার। সকাম ও নিষ্কাম। এই উভয়বিধ সাধনারই প্রধানসাধন—ভক্তি। ভক্তি দ্বিবিধ। যুক্তি-পরাহত-ভক্তি ও অন্ধ-ভক্তি। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি, আমাদিগের হৃদয়ের স্বতঃপ্রবৃত্ত এমন একটী স্থায়ীভাব থাকে যে, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতিপাদবিক্ষেপ আরাধ্য বলিয়া বোধ হয়, পরোক্ষদৃষ্ট অবৈধাচার, আমাদিগের নিকটে একান্ত বৈধ বলিয়াই প্রতীত হয়। হৃদয়ের এই ভাবের নামই ভক্তি, এবং ইহাই অন্ধ-ভক্তি। আর, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ঐ স্থায়ীভাব যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত না হইয়া, যুক্তিমীমাংসাবলে সঞ্জাত হয়, অর্থাৎ তদীয় কার্য্যগত ভাব আপাতদৃষ্টে অবৈধ বলিয়া বোধ হইলেও যুক্তি মীমাংসায় তাহা বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া আমাদিগকে এরূপ অবস্থায় উপনিত করে, যে, ন্যায়ের অনুরোধে তাঁহার প্রতি ঐ স্থায়ীভাব ন্যস্ত না করিয়া স্থির থাকিতে পারি না, তাহা হইলে এই স্থায়ীভাবকেও ভক্তি বলে, এবং ইহার নামই যুক্তিপরাহত-ভক্তি। এই উভয়বিধ ভক্তিই সাধনার মূলভিত্তি রূপে পরিগণিত। প্রকার ভেদে সকাম ও নিষ্কাম, এই উভয়বিধ সাধনার একমাত্র পথপ্রদর্শক —ভক্তি। ভক্তিহীন সাধনা—সাধনাই নহে, তাহা লোকাচার ও লাঞ্ছনা মাত্র। চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ বা তাহার অন্যতমেরও ফলদ না হইয়া প্রত্যুত জঘন্য অপবর্গেরই আশ্রয়ীভূত হয়। এ সাধনায় জীবের মুক্তিলাভ দূরে থাকুক, বরং প্রাক্তনপুণ্যের বিলুপ্তি উপস্থিত হয়। তাই বলি, মুক্তির জন্য সাধনা করিতে হইলে, অগ্রে ভক্তির সাধনা আব-

শাক। যে সংযতচেতা মহাত্মা ন্যায়মীমাংসাদর্শনাদিধৃত বৈদিক বিধি ব্যবস্থার পক্ষপাতি হইয়া তৎপ্রদর্শিত পথাবলম্বনে, অতি সন্তর্পণে মুক্তির দিকে অগ্রসর হন, আমরা বলি, যুক্তিপরাহত-ভক্তিই তাঁহার পথপ্রদর্শক। পক্ষান্তরে, যিনি বৈদিক ব্যাপারে উদাসীন থাকিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত অপূর্ব্ব ঐকান্তিক মধুরভাবে প্রণোদিত হইয়া সানুষ্ঠিত সাধনায় আত্মবিভোর হন, অন্ধ-ভক্তিই তাঁহার অবলম্বন। অন্ধ-ভক্তি যুক্তিমীমাংসার প্রতিপত্তি চাহে না, আত্মভাবেই সে আত্মহারা, অভিষ্টমূর্ত্তিই তাহার অনন্যগতি। হৃদয়ের বিমল আনন্দে সে সদানন্দ। অনির্ব্বচনীয় শান্তিসুখ, সে সতত সম্ভোগ করে। তিনিই যথার্থ ভক্ত, তিনিই উন্নত সাধক, তিনিই ভগবানের প্রকৃত সেবক—যিনি অন্ধভক্তিমাত্র সহায়ে মুক্তিপথ পরিষ্কৃত করিতে পারেন। ভগবান ঈদৃশ সাধু ভক্তের সাধনা সহজে ও অবিকল্পে সংসিদ্ধ করেন। মহারাজ উত্তানপাদের বংশ-ধর পুত্র ভক্তচূড়ামণি পঞ্চমবর্ষীয়শিশু মহাত্মা ধ্রুবের অদ্ভুত সাধনা ও সিদ্ধির বিষয়, অন্ধ-ভক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১

নিভৃত কানন প্রদেশ, মূর্ত্তিমান শান্তি বর্ত্তমান। হিংস্র জীব জন্তুর নাম মাত্র নাই. থাকিলেও তাহারা তপোধনগণের তপঃ প্রভাবে হিংসাবৃত্তি পরিহার করিয়া গৃহপালিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। পাদপ-সমূহ ফলপুষ্পে নমিত হইয়া উচ্চের শান্তভাব প্রদর্শন করিতেছে। বন্যকুসুম-সমূহ প্রস্ফু-

টিত হইয়া দিক সমূহ আমোদিত করিতেছে। একটী বৃহৎ বটবৃক্ষতলে ঋষিকুমারগণ নানাবিধ ক্রীড়া করিতেছেন। তাহাদিগের কুটীলতাশূন্যহৃদয়ের হাস্যধ্বনি, মধ্যে মধ্যে বটবৃক্ষকে প্রতিধ্বনিত করিয়া উৰ্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। এইরূপ খেলা কতক্ষণ চলিত কে জানে? কিন্তু অকস্মাৎ বালকগণের খেলা ভাঙ্গিয়া গেল, একটী বালক উৰ্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে খেলা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, মুনিকুমারগণ বিমর্ষ হইয়া, যে যাহার কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

সংবাদ বৃদ্ধ ঋষির নিকটে পৌঁছল। তিনি মুনিকুমারগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন "বৎসগণ। ধ্রুবকে তোমরা কি বলিয়াছ? সে অদ্য তোমাদিগের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। কেন? তাহার রোদনেরই বা কারণ কি?" মুনিকুমারগণ কহিলেন "তাতঃ। আমরা ধ্রুবকে কোন কথাই বলি নাই, গালিও দিই নাই, কেবল আমরা পরস্পরের নাম ও পিতার নামাদি জিজ্ঞাসা করায় ধ্রুব, পিতার নাম বলিতে অসমর্থ হইয়াছিল বলিয়া, আমরা সকলে হাস্য করিয়াছিলাম মাত্র। ধ্রুব, আমাদিগের হাস্য দর্শনে অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিয়াছিল। এতদ্ব্যতিত আমরা আর কিছুই জানি না।" ঋষিবর, বালকগণকে কহিলেন "সাবধান তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" মুনিবালকগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ধ্রুব, জননীর নিকট আসিয়া অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুনীতি পুত্রের ঈদৃশভাব অবলোকনে ব্যথিতা হইয়া কহিলেন "বৎস! কিজন্য রোদন করিতেছ? মুনিবালকগণ

কি তোমাকে প্রহার করিয়াছে, না ক্রীড়া করিতে নিষেধ করিয়াছে? কোন স্থানে ত আঘাত প্রাপ্ত হও নাই? বল বৎস! রোদনের কারণ কি?" ধ্রুব অনেক ক্ষণ পরে কহিলেন "মা! আমার পিতা কে? তিনি কোথায়? তিনি কি আশ্রম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে তপশ্চরণার্থ গমন করিয়াছেন? পিতার নাম কি মা? মুনিকুমারগণ আমাকে পিতৃনামোচ্চারণে অসমর্থ দেখিয়া উপহাস করিয়াছে! বল মা, পিতা কোথায়?" ধ্রুবের বাক্য শ্রবণে সুনীতি বিষম ব্যথিতা হইলেন, রোদন করিতে করিতে কহিলেন "বৎস, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না, সে কথা শুনিলে তোমার আরও দুঃখ হইবে। আইস, স্নান ভোজন করিয়া পাঠাভ্যাস কর।" ধ্রুব, মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া দৃঢ়তা সহকারে কহিলেন "মা! সে সকল কথা না বলিলে, নিশ্চয়ই আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। যে আপন পিতার নাম জানে না, যে আপন পিতাকে চিনে না, তাহার মত পামর আর জগতে নাই। আপনি পিতার সমস্ত কথা বলুন, নিতান্ত দুঃখের হইলেও আমি দুঃখ করিব না।" ধ্রুবের নিতান্ত একাগ্রতা দর্শনে জননী কহিলেন "বৎস! যদি সেই সমস্ত দুঃখজনক কথা শুনিতে তোমার নিতান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর। বৎস! তুমি মুনিকুমার নহ। তোমার পিতাও মুনি নহেন; তিনি রাজা, তুমি রাজকুমার। তুমি কি জাননা, যে, সসাগরা ধরার এবং তোমরা যে অরণ্যে বসতি করিতেছ, তাহার অধিকারীর নাম মহারাজ উত্তানপাদ। তিনিই তোমার পিতা। মহারাজের সুরুচী নাম্নি আর একজন মহিষী আছেন। আমি জ্যেষ্ঠা, তিনি কনিষ্ঠা। মহারাজ, কনিষ্ঠা

মহিষীর বশীভূত হইয়া, আমাকে গর্ভাবস্থায় বনবাসে প্রেরণ করেন *। সেই হইতে আমি এই অরণ্যে অবস্থান করিতেছি, তোমার জন্মস্থানও এই অরণ্য। তুমি রাজকুমার। আমার অদৃষ্টক্রমে রাজভোগে না থাকিয়া অরণ্যজাত ফলমূল আহারে প্রাণ ধারণ করিতেছ।" ধ্রুব, মাতার এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন "মা। আমি পিতাকে দেখিতে যাইব, আমাকে অনুমতি করুন। আমি একবারের জন্য আমার রাজা পিতাকে দেখিয়া আসি, আজিই আবার আসিব, চিন্তা কি মা? আমাকে বিদায় দিন।" শুনিয়া সুনীতি আরও শোকাকুলা হইলেন, রোদন করিয়া কহিলেন "কেন বৎস। সেখানে গিয়া অপমানিত হইবে? আমাদের অদৃষ্টদোষে হয়ত তিনি প্রত্যাখ্যান করিবেন, আর তুমি অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিবে! না বাছা, সেখানে যাওয়া হইবে না, কাজ নাই বৎস, ক্ষান্ত হও। কাজ নাই তোমার পিতৃদর্শনে। যদি অদৃষ্টে থাকে, এইখানেই তাঁহার দর্শন পাইবে, আপাতত এ সংকল্প পরিত্যাগ কর।" ধ্রুবের মন তখন পিতৃচরণ দর্শনে ব্যাকুল হইয়াছে, পিতা রাজা, তাঁহারা ভিখারী, পিতার নিকটে এ তত্ত্বের একবার তত্ত্ব লইবেন, তিনি

---

* পুরাণ বিশেষে দেখিতে পাই, মহিষী অরণ্যেই গর্ভবতী হইয়াছিলেন। রাজা ইহাঁকে বড় ভালবাসিতেন, কেবল কনিষ্ঠা মহিষীর কথায় তাহাকে বনবাসে প্রেরণ করেন, পরে মৃগয়াচ্ছলে ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ধন্য স্ত্রৈণতা। রাজা উত্তানপাদও একটী অদ্বিতীয় রামকান্ত"।

আকুল হইয়া কহিলেন "না মা, আপনার চরণে ধরিয়া বলি, আমাকে বাধা দিবেন না। যে রাজার-পুত্র হইয়াও বনবাসী, তাহার আবার অভিমান কি মা? তাহার আবার মানাপমান কি মা? আপনি চিন্তা করিবেন না, আমি এখনি আসিব।" সুনীতি আর পুত্রকে নিষেধ করিলেন না। নিষেধ করিয়া রাখিতেও পারিলেন না। কহিলেন "সাবধান বৎস! যেন কোন অনর্থ ঘটাইও না। সেখানে তোমাকে অনেক অপমান সহ্য করিতে হইবে, অনেক অত্যাচার দেখিতে হইবে, কিন্তু সাবধান বাপ্, যেন তাহাতে ক্ষুব্ধ হইও না! মহারাজের 'উত্তম' তনয় কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেও, বহু বাদবিসম্বাদেও কোন প্রতিবাদ করিও না, অনাহারে থাকিলেও তথায় আহার্য্য প্রার্থনা করিও না, তৃষ্ণাতুর হইলে বরং নদী হইতে জলপান করিবে, তথাপি সে রাজসংসারে জল চাহিও না! মহারাজ যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলিও "আমার অভাগিনী মা এখনও বাঁচিয়া আছেন।" ধ্রুব "যে আজ্ঞা" বলিয়া মাতৃ-পদরজ মস্তকে লইয়া বয়স্ক মুনিকুমারদ্বয়সহ অরণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরাভিমুখে রাজসভার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

২

মহারাজ উত্তানপাদ অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনটী মুনিবালক সভাতলে প্রবিষ্ট হইল। তিনটীর মধ্যে দুইটী বালক কুলক্রমাগত নিয়মানুসারে দক্ষিণহস্ত

উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ ও অবশিষ্টটী আশীর্ব্বাদ আকাঙ্খায় ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া দূরে দণ্ডায়মান হইল। মহারাজ বালকত্রয়কে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিয়া আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকত্রয়ের অসামান্য দেহজ্যোতি, সভার তাবত লোককে আকৃষ্ট করিল। রাজার আজ্ঞাক্রমে মুনিকুমার কহিলেন "মহারাজ! ইনি আপনার জ্যেষ্ঠামহিষীর গর্ভজাতসন্তান, নাম 'ধ্রুব', আপনার চরণদর্শনই ইহাঁর আগমনের কারণ।" মহারাজ সন্দেহাকুলিত হৃদয়ে কহিলেন "এত অল্প বয়সে পিতৃচরণ দর্শনের বাসনা কেন?" মুনিকুমার কহিলেন "তাহারও কারণ আছে। কল্য যখন আমরা সকলে ক্রীড়া করিতেছিলাম, তখন কথা প্রসঙ্গে সকলের পিতার নাম কি, তাহাই জিজ্ঞাসা করা হয়। আমরা সকলেই স্ব স্ব পিতার নাম বলিলাম, কিন্তু ধ্রুব পিতৃনাম উল্লেখে অসমর্থ হইল দেখিয়া আমরা সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলাম। ধ্রুব, অভিমান করিয়া মাতৃসমীপে গমন ও তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। উপযুক্ত পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ করুন, পুত্রোচিত সংকারে ধ্রুব পরিতৃপ্তিলাভ করুক।" মহারাজ মুনিকুমারগণের বাক্য শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, ধ্রুবকে ক্রোড়ে করিতে, ধ্রুবের মুখ চুম্বন করিতে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল, কিন্তু সাহস করিয়া তাহা পারিয়া উঠিলেন না পাছে এ সংবাদ মহিষী শুনিতে পান, এই ভয়ই উক্ত আশাকে বারম্বার পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এ দিকে মুনিকুমারগণ ধ্রুবকে কহিলেন "যাও না, বিলম্ব কেন? পিতৃক্রোড়ে স্থান গ্রহণ করিয়া বাসনা পূর্ণ কর।" মুনি কুমারগণের

বারম্বার উত্তেজনায়, ধ্রুব, মহারাজের নিকট গমন করিলেন। তখন কি আর প্রত্যাখ্যাণ করা যায়? তখন কি আর পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ সম্ভবে? মহারাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইলেন। সভাস্থ সকলে মহারাজকে বারম্বার ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

৩

দুষ্টলোক সর্ব্বত্র। যেখানে একটু ভাল, সেইখানেই রাশী-রাশী মন্দ। সংসারের গতিই এই প্রকার। মহারাজ ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইতে না লইতে, অন্তঃপুরে এ সংবাদ রাষ্ট্র হইল। মহিষী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া আলুলায়িতকুন্তলে বিত্রস্ত বসনে সভাতলে আসিয়া উপস্থিত! মহারাজ, মহিষীর তাদৃশীদশা দর্শনে, বিষম বিপন্ন হইলেন। ধ্রুবকে নামাইতেও পারিলেন না। মহিষী বেগে আসিয়া, ধ্রুবকে মহারাজের ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন। তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিলেন "এ কি করিলে? তুমি রাজা, রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট, এখানে কি বলিয়া তুমি ধ্রুবকে ক্রোড়ে করিলে? যদি ক্রোড়ে লইতেই নিতান্ত বাসনা হইয়াছিল, তবে সিংহাসন হইতে নামিয়া কেন ক্রোড়ে করিলে না? ইহাতে কি সিংহাসন কলঙ্কিত করা হইল না? ধ্রুবকে সিংহাসনে গ্রহণে, আমাকে এবং রাজকুমার উত্তমকে কি অপমান করা হইল না? ধ্রুব কি তোমার অবর্ত্তমানে রাজ-সিংহাসন পাইবে, যে, উহাকে রাজসিংহাসনে উঠাইলে? ধিক্! তোমাকে!" রাজা নীরব, মুখে কথাটী নাই। মহিষী তখন

ধ্রুবের দিকে চাহিয়া কহিলেন "ভাল ধ্রুব! তোমারই বা কেমন সাহস? তুমি অরণ্যচারী, বনবাসী, তুমি রাজসিংহাসনে উঠিলে কেন? মনে করিও না, তোমাকে আমি কটু কথা বলিতেছি ভাবিয়া দেখ, রাজ-সিংহাসন লাভ, পূর্ব্বপুণ্যের ফল। সে পুণ্য না করিলে কি তাহা লাভ করা যায়? এই সামান্যকথায় বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, তুমিও রাজার ঔরসজাত, আমার উত্তমও তাই, কিন্তু দু'জনের অবস্থা একবার তুলনা করিয়া দেখ দেখি। আর, যদি তুমি মনে করিয়া থাক, যে, তুমি সিংহাসনে বসিবার যোগ্য, তাহা হইলে সে বাসনা পরিত্যাগ কর? রাজারা নানাদেশে গমনাগমন করেন, এবং নানা স্থানেই বিবাহ করেন। কিন্তু তাই বলিয়া সে সকল পুত্র কি রাজ্য পায়! আমার উত্তম যে পুণ্য করিয়াছে, তুমি যদি সে পুণ্য করিতে, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি সিংহাসন লাভ করিতে পারিতে। "ধ্রুব, বিমাতার এই সমস্ত কথায় বিষম মর্ম্মাহত হইলেন। মহারাজও কুণ্ঠিত হইলেন, তিনি মনে মনে বুঝিলেন, এতটা বলা ভাল নয়, কিন্তু কি করেন, তিনি মহিষীর রাঙ্গাচরণে বিক্রীত। বুদ্ধি, বিবেক, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও গতি মতি তাঁহারি শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং মনের কথা মনেই রহিল। মুখ ফুটিয়া সে কথা আর বলিতে পারিলেন না। ইচ্ছা সত্ত্বেও সাহসে কুলাইল না।

সুরুচীর কঠোর বচনে, ধ্রুবের কুসুমকোমল হৃদয়ে অপার অভিমান উথলিয়া উঠিল। নিদারুণ সন্তাপে, ক্ষোভে ও মর্ম্ম-বেদনায় যারপরনাই আকুল ও নির্ব্বাক হইয়া চিত্র-পুত্তলীর মত, ধ্রুব, বহুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অনন্তর অতিকষ্টে

উচ্ছসিত বেগ সংবরণ করিলেন ; কিন্তু, কি বলিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। জননীর হতাশ-ভবিষ্যবাণী স্মৃতিপথে উদিত হইল, কি বলিয়া তাঁহাকে গিয়া সান্ত্বনাকথা শুনাইবেন, সহচর মুনিকুমারগণের প্রগল্‌ভ-বাক্যের কি বলিয়া প্রতিবাদ করিবেন, বড় আশা, বড় ভরশা করিয়া তিনি যে রাজপ্রাসাদে আসিয়াছিলেন,——রাজপ্রসাদে রাজপুত্র নাম প্রতিপাদন কারবেন বলিয়া! সকল আশায় হতাশ হইয়া, পবিবক্তে, সকলের সম্মুখে দারুণ অপমান ও লাঞ্ছনায় জীবন্মৃত হইলেন! এখন কোন মুখে আর এ জীবন ধারণ করিবেন! অগত্যা, প্রাণ পরিত্যাগই নির্দ্ধারিত হইল। আবার ভাবিলেন, মারব কি জন্য! আমি বনবাসী নই, আমি বনবাসীর পুত্র নই, আমরা নিঃস্ব নহি, মা আমার আজন্ম বন-বাসিনী দুঃখিনী নহেন, সসাগরাসদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর মহারাজ উত্তানপাদ আমার পিতা, প্রধানামহিষী আমার জননী, আজি দৈবদোষে বনবাসে পড়িয়াছি। আমি মরিব কি জন্য এ সকল ত সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন করিলাম, তবে পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্য করিনাই, তাই রাজসিংহাসনে স্থান পাইলাম না, সুরুচী মায়ের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি নাই, তাই পিতার আদর পাই-লাম না। উত্তমের ন্যায় মহারাজের সোহাগের ভাগ পাইলাম না। মুনিকুমারগণ জানিলেন, আমি পিতার ও দুঃখনী মাতার যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলাম, তবে মরিব কি জন্য? মরিব না, জননীর নিকট যাই, এখনই যাহাতে পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্য প্রাপ্ত হই, তাহাই করিব। ভাল করিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লই—কি করিলে দুঃখিনী মা আমার, আর বনবাসী আমি, গৃহবাসী

হইয়া এই রাজনিকেতনে, রাজ পরিবারে থাকিতে পারি। ভাবিতে ভাবিতে আশার সঞ্চার হইল, বাষ্পাকুল লোচনে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মা! কি পুণ্য করিলে আমাদের এ দুঃখ দূর হয়? পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্য কোন পুণ্যে কোথায় পাওয়া যায়? আমি উত্তমের মত, আর বনবাসিনী মা আমার তোমার মত, কোন পুণ্যে আসিয়া মিলিতে পারি? বল মা, এখনই মা'কে বলিয়া আমি তাহাই করিব।

মহিষী কহিলেন, "যাও—অরণ্যে, হিংস্র জন্তু পূর্ণ অরণ্যে, একাকী পদ্মপলাশলোচন হরির সাধন কর। হরি সাধনে উত্তমের ন্যায় পুণ্যবান হইয়া যদি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে পার, তবেই রাজ্য লাভ করিতে পারিবে, রাজসিংহাসনে বসিতে পারিবে, কিন্তু মনে করিও না, তোমার সেই তপস্বিনী জননীর গর্ভে জন্মিয়া সিংহাসন পাইবে।" ধ্রুব, নিস্পন্দ হইয়া সমস্তই শ্রবণ করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া শেষবার পিতা মাতার চরণ ধারণ করিয়া নয়নজলে তাঁহাদিগের চরণ অভিসিক্ত করিয়া, মর্ম্মাহত ধ্রুব, সহসা তড়িৎ-গতিতে সভামণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মুনিকুমারদ্বয় নিঃশব্দে আসিয়া ধ্রুবের সহিত মিলিত হইলেন। সভাস্থ সকলকে স্তম্ভিত করিয়া মুহূর্ত্তেই তিন জনে অদৃশ্য হইলেন। সসাগরা বসুন্ধরার একচ্ছত্রী রাজাধিরাজ মহারাজ উত্তানপাদের জ্যেষ্ঠকুমার ধ্রুব, অনাহারে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। বিধাতঃ! এ তোমার কোন চক্র!!

———

৪

ধ্রুব, মাতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। সুনীতি অঞ্চলে নয়নমার্জ্জন করিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ধ্রুব কহিলেন "কেন মা? বিমাতার কথায় ত আমার দুঃখ হয় নাই? আমাদিগের পুণ্য নাই, সেই জন্যই আমরা বনবাসী! সিংহাসনে পুঞ্জ-পুঞ্জ পুণ্য না হইলে কি কেহ বসিতে পারে মা? মা! আমাদিগের এই গহন কানন মাঝে আপনার বলিতে কি আর কেউ নাই মা? পুণ্য কোথা থাকে বলিয়া দিলে, আমি এখনি আনিতে পারি। কে বলিয়া দিবে! কে দেখাইয়া দিবে? বল, বল মা! আমাদিগের আর কি কেহ নাই মা?" বাষ্পভরে ধ্রুবের কণ্ঠরোধ হইল। দুঃখিনী সুনীতির দুঃখভার একবারে শতগুণে উথলিয়া উঠিল। পুত্রকে সান্ত্বনা করিবেন কি, অজস্র অশ্রুধারে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল! সুনীতি, কাঁদিতে কাঁদিতে ধ্রুবকে অঙ্কে তুলিয়া লইলেন, জীর্ণ বসনাঞ্চলে কখন পুত্রের অশ্রু, কখন তদ্দ্বারা আপনার অশ্রুসম্পাতের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। ধ্রুব কিয়ৎকাল পরে কথঞ্চিত শান্তির আবেশে অল্পে অল্পে নয়ন উন্মিলন করিলেন। দেখিলেন, জননী তাঁহার মুখ-চান্দ্রমার প্রতি নিমেষশূন্যনেত্রে চাহিয়া আছেন! জননী নীরব, সর্ব্ব শরীর নিস্পন্দ—নীরবে গণ্ড বহিয়া অনবরত অশ্রুধারা বহিতেছে। ধ্রুব, 'মা মা' বলিয়া গদ্গদকণ্ঠে কত ডাকিলেন——উত্তর নাই! ধ্রুব রোদন করিতে লাগিলেন—"মা মা, ও মা! একবার আমার কথা শুন মা, কি জন্য তুমি এমন হলে মা? ওমা দুঃখিনী মা আমার, এ দুঃখ দূর

করিব মা! যেরূপে হউক আমাদের দুঃখ দূর হবে মা, আর কাঁদিও না, একবার আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ক্ষণেকের জন্য বিদায় দাও। আমি সেই পদ্মপলাশলোচনের কাছে যাই মা, তিনি ঐ দূর বনে গহন কাননে বসিয়া আছেন, আমি এখনি গিয়ে তাঁর চরণে ধ'রে সেধে কেঁদে ভিক্ষা চাব মা! তাঁকে ব'লে তোমার দুঃখ, আমার মনের দুঃখ সকলই তাঁকে ব'লে যাহাতে এ দুঃখের অন্ত হয়, যাহাতে তিনি আমাদের মঙ্গল করেন, তাই করিব মা! আমি এখনি তাঁর নিকটে যাব, এখনি আবার আসিব মা, একবার আমার কথা শুন, একবার আমায় বিদায় দাও, কথা কও মা!!" সুনীতি অকস্মাৎ চমকিত হইয়া উঠিলেন। ধ্রুবকে আপনার বাহুবল্লির মধ্যে বাঁধিয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে অঙ্কে আবদ্ধ করিলেন। ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। ধ্রুব বলিলেন, "মা! আমায় বিদায় দাও, আমি হরির নিকট হইতে এখনি আসিব।" সুনীতি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বৎস! ক্ষান্ত হও, আর আমাকে দুঃখিনী করিও না, আমায় ছেড়ে যেও না বাপ! কোথা যাবি ধ্রুব!—পদ্মপলাশলোচন হরি আমাদের একজন আত্মীয় আছেন সত্য! তিনি গহন বনে বসিয়া আত্মীয় স্বজনের দুঃখ দূর করিবার উপায় করিতেছেন সত্য, কিন্তু, ধ্রুব! তাঁ'রে ত কেহ সহজে দেখিতে পায় না বাছা! তুমি ত অজ্ঞান শিশু, কত শত শত যোগী ঋষি সাধুগণ, কত শত শত বৎসর অনশনে একাসনে বসিয়া কত কঠোর সাধ্য সাধনা করিয়াও যে তাঁ'র চরণ দর্শন পান না! ধ্রুবরে! পদ্মপলাশলোচন হরি সর্ব্বত্রেই আছেন, অলক্ষে বসিয়া সকলকেই রক্ষা করিছেন! আয় ধ্রুব! এই কুটীরে বসিয়া মাতা পুত্রে

তাঁহার সাধনা করি, অবশ্যই তিনি সদয় হইবেন, তিনি ভক্ত-বৎসল, ভক্তগত তাঁহার প্রাণ, তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি রাখ বাপ্। আমিও দুঃখ হ'তে মুক্তি পা'বার জন্য ভক্তিভরে তাঁহার আরাধনা করিতেছি, তাঁহার নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়াই, আমাদের দিনপাত হইতেছে! অসময়ে তিনিই রক্ষা করিবেন, তোমার আর কোথাও গিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে না, তিনি সকলেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন, গৃহে বসিয়া নয়ন মুদিয়া দেখিলেই, হৃদয়ে তিনি উদয় হইবেন, তাঁহার জন্য বনে কেন বাপ? তুমি মুনিবালকগণের সহিত খেলা করগে, আমিই তাঁহাকে আমাদের দুঃখ জানাইতেছি।"

ধ্রুব, জননীর কথায় মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু, স্বয়ং একবার পদ্ম-পলাশলোচনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠা হইতে লাগিল। বিমাতার অবমাননা বাক্যে, পঞ্চমবর্ষীয় ক্ষত্রিয় শিশু, ক্ষত্রিয়সুলভ মনোবেগে উত্তেজিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। রজনীযোগে, সুনীতি, যখন ধ্রুবকে অঙ্কে ধারণ করিয়া পর্ণ-কুটীরে পর্ণ-শয়নে গভীর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, সহসা, ধ্রুব, উঠিয়া জননীর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক পবিত্র পদরজঃ মস্তকে লইয়া, সেই গভীর নিশীথে সেই কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিঃসহায় পঞ্চমবর্ষীয়শিশু হরি দর্শনাভিলাষে হরিনামমাত্র সহায়ে গহন বনাভিমুখ হরির উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

নিদাঘ মধ্যাহ্ন, মার্ত্তণ্ডদেব প্রচণ্ড প্রতাপে ধরণী শাসন করিতেছেন ; প্রখর হলাহলরৌদ্রের উত্তাপে প্রকৃতিদেবী জর্জ্জর হইয়া একান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃতি নিস্পন্দ নির্নিমেষ—সংজ্ঞাশূন্য। মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, সমস্ত প্রাণী প্রাণভয়ে কে কোথায় লুকাইয়াছে! অরণ্যানী স্তম্ভিত! অপরিস্ফুট "ঝাঁ ঝাঁ" রবে দিগঙ্গনা ভীষণযন্ত্রণা মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছে। এই ভীষণসময়ে, ভীষণ অরণ্যানীর উর্দ্ধপ্রদেশ দিয়া, দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে মূর্ত্তিমান দীপক রাগে, এই জগতের আদি-অন্ত কার্য্যকারণকারী ভগবান হরির মহিমা গান করিতে করিতে নিত্যধামে গমন করিতেছেন, অকস্মাৎ তাঁহার বীণাঝঙ্কার প্রতিরুদ্ধ হইল ; যে বীণাঝঙ্কারে প্রাণ মাতাইয়া তিনি বিভোর হৃদয়ে গান করিতেছিলেন, তাঁহার সে ঝঙ্কার—সে ধ্বনি অতিক্রম করিয়া যেন কি এক স্বর্গীয় মধুর কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। দেবর্ষি সবিস্ময়ে সোৎসুক্যে উর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বপ্রদেশ সমস্ত লক্ষ করিয়াও কোথায়ও কাহার দর্শন পাইলেন না! বিস্ময়কৌতূহল সমধিক বর্দ্ধিত হইল ; শুনিলেন—আবার সেই কণ্ঠধ্বনি, দেবর্ষি নিবিষ্টচিত্তে বিশেষ লক্ষ করিয়া শুনিলেন—অধোভাগে গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া কে গাহিতেছে ;——

কই পদ্মপলাশলোচন!
কই হরি কই তুমি, কাঁদিতেছি এত আমি,
তবু ত দিলে না দরশন!

বল আর কে আছে আমার ?
ক্ষুধায় শুকা'ল মুখ, তৃষ্ণায় ফাটিল বুক,
কৈ তুমি দিলে না খাবার !

মা আমায় দিয়েছেন ব'লে—
আছ তুমি সর্ব্বঠাঁই, তোমা বিনে কেহ নাই,
দুঃখ হ'লে কর তুমি কোলে !

আমাদের বড় দুঃখ হায় !
বিমাতার বাক্য দোষে, মা আমার বনবাসে,
দিন যায় শুধু ভিক্ষা করি !

রক্ষা কর—দেহ দরশন।
এত কেঁদে ডাকি আমি, তবু ও নিদয় তুমি,
হরি—পদ্মপলাশলোচন ॥

দেবর্ষি আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না, মুহূর্ত্তে অবতরণ করিলেন। ইতস্ততঃ অন্বেষণে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, তাপসতরুমূলে এক পঞ্চমবর্ষীয় সুকুমার শিশু, ঊর্দ্ধ মুখে অনবরত রোদন করিতেছে। শিশুর সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, অঙ্গসৌষ্টব সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন। দেবর্ষি শিশুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন দেখিলেন—শিশুর ললাটফলকে মহারাজ-চক্রবর্ত্তী—চিহ্ন, কলেবর ধূলায় ধূসরিত নহে, বনজাত কুসুমের অনিলতাড়িত রেণু-পরাগে আচ্ছন্ন। শিশু, একতানমনে ঊর্দ্ধমুখে

ডাকিতেছেন—"হরি-পদ্মপলাশলোচন।" দেবর্ষি, শিশুর চিবুক ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, গদ্গদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধন্য বৎস! কে তুমি?" ধ্রুব, অবিশ্রান্ত—রোদনে—অনাহারে—অনিদ্রায় নয়নের জ্যোতি হারাইয়াছেন! যাহা আছে, তাহাও অশ্রুসম্পাতে আচ্ছন্ন—করপুটে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া, ধ্রুব, দেখিলেন,—সম্মুখে দিব্য-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। ধ্রুব দণ্ডবৎ হইয়া দেবর্ষির চরণতলে পড়িলেন। চরণে ধরিয়া কাঁদিয়া ধ্রুব বলিলেন "পদ্মপলাশলোচন হরি, এত নির্দয় তুমি? মা ব'লেছিলেন, আর আমাদের কেহই নাই, হরি! তুমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রক্ষা কর, বড় দুঃখ পেলে তুমি হরি কোলে কর! আমি এতদিন যে কিছুই খেতে পাই নাই হরি, তৃষ্ণার কাতরে—বড় কাতরে তোমায় কত ডাকিলাম হরি, উত্তর দিলেনা, দেখা দিলেনা, এতদিন কোথায় ছিলে হরি,—কৈ চূড়া বাঁশী কৈ?—" নারদ দেখিলেন বিষম সঙ্কট, অজ্ঞান শিশু হরিপ্রেমে একবারে অজ্ঞান, হইয়াছে! তখন, তিনি, ধ্রুবকে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন, মুখচুম্বন করিয়া স্নেহের সকরুণে কহিলেন "বৎস রে! আমি তোর পদ্মপলাশলোচন হরি নই, তাঁর দাসানুদাসের সেবক আমি—আমি নারদ। বৎস! এ শৈশবে কি হরি দর্শন হয়? কেন বৃথা তাঁর দর্শন কামনা কর? আর, এ অবস্থায় জননীর অঙ্কে, পিতার সোহাগে বিমলানন্দে দিনগত করিবে, কেন এ ভীষণ কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও? যে হও সে হও বৎস——নিরস্ত হও।

ধ্রুব, বড় আশায় নিরাশ হইলেন, ভাবিয়াছিলেন হরি তাঁহার দুঃখ দূর করিতে দেখা দিয়াছেন, এখন পরিচয়

পাইয়া, ছলছল নেত্রে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হতাশব্যঞ্জক করুণস্বরে ধ্রুব বলিলেন "কে তুমি! পদ্মপলাশলোচনহরির দাস! দেব! হরি এখন কোথায়? তিনি কি এ বনে থাকেন না? কোথায় তিনি? এত ডাকিতেছি. এত কাঁদিতেছি, তিনি আসেন না কেন দেব? মা আমার কত ভাবিতেছেন যে! আমার অদর্শনে দুঃখিনী বনবাসিনী মা আমার ধরাসনে প'ড়ে আছেন যে! হরির দর্শন পেলে মা'কে গিয়ে সান্ত্বনা করিব—কিন্তু কৈ? আর, তুমি যে আমায় নিবারণ করিতেছ, হরিকে দেখিতে পাইব না বলিতেছ, নিশ্চিন্তে পিতার সোহাগে মাতার আদরে ঘরে থাকিতে বলিতেছ, তুমি কি জান না দেব, পিতা সিংহাসন হইতে আমাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন! মা'কে আমার রাজা পিতা বনবাসিনী করিয়াছেন! আমরা রাজ্যসুখে বঞ্চিত হ'য়ে বনবাসে এসেছি। তুমি কি তা জান না দেব?"

নারদ গম্ভীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে পিতা?" কাঁদিতে কাঁদিতে ধ্রুব উত্তর করিলেন "মহারাজ উত্তানপাদ।"

দেবর্ষি, মুহূর্ত্তে ধ্যানযোগে আদ্যোপান্ত সমস্ত জানিতে পারিলেন। হস্তস্থিত বীণা ও কমণ্ডলু মৃত্তিকার উপর রক্ষা করিয়া, ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। উত্তরীয় গৈরিকাঞ্চলে ধ্রুবের কাঞ্চনবপু মার্জ্জন করিলেন। শেষ-পরীক্ষার্থ আবার বলিলেন "ধ্রুব! কিন্তু বিষয় বড়ই কঠিন, তুমি নিতান্তই শিশু, কিরূপে হরির দর্শন পাইবে? আর কেনই বা তাঁহার দর্শন জন্য নিদারুণকষ্ট সহ্য করিবে? বৎস্য! ক্ষান্ত হও, চল, তোমার পিতাকে বলিয়া তোমাদিগকে রাজপুরীতে রাখিয়া আসি, আমা-

হইতেই তোমাদের দুঃখ দূর হইবে। বৎস! তাহাই কর, এ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর।”

ধ্রুব, মহর্ষিবাক্যে যে উত্তর প্রদান করিলেন, যে ভাবে মনোবেগ উচ্ছ্বসিত করিলেন, কে বলিবে আর—ধ্রুব পঞ্চমবর্ষীয় শিশু? ধ্রুব, স্থীরগম্ভীরমূর্ত্তিতে কিয়ৎকালপর্য্যন্ত দেবর্ষির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সহসা পদ-দলিত ভুজঙ্গসদৃশ প্রজ্বলিত ভাব ধারণ করিলেন। চক্ষু হইতে যেন অনলকণা নিঃসৃত হইতে লাগিল, ধ্রুব কহিলেন “কে তুমি? যে হও সে হও, আমার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হও। আমি তোমার কথা শুনিয়া প্রাণের পদ্মপলাশলোচনের দর্শনবাসনা পরিত্যাগ কখনই করিব না। আমি তুচ্ছ রাজসিংহাসনের আশায়, রাজভোগের আশায় হরির অন্বেষণে বাহির হই নাই। পিতা, বিমাতার বাক্যে আমাকে কোলে লইলেন না, সিংহাসন হইতে দূরে নামাইলেন, দেখিব, আমাদের পদ্মপলাশলোচন আছেন, তিনি আমাকে কোলে লইবেন কি না, আমি পিতার সোহাগ চাহিনা, আমাদিগের পদ্মপলাশলোচন আছেন, আমাদিগের হরি আমাকে সোহাগ করিবেন। মা বলিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই পৃথিবীতে নাই যিনি সকল দুঃখ দূর করিতে পারেন, এ কথাও আমার দুঃখিনী জননীর বাণী। আমি জীবনপণে হরির অন্বেষণ করিব। এখানে না পাই, অন্য স্থানে যাইব, নগরে—কান্তারে, পর্ব্বতে—শিখরে, সমস্ত পৃথিবী সমস্ত জগত বেড়াইব। দেবর্ষি! আমি অসহায়ে গহন বনে এসে তিনদিন উপবাসে আছি, অনাহারে অনিদ্রায় অনবরত কাঁদিয়া বেড়াইতেছি, এক একবার ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ ফাটিয়া যায়—অবসন্ন

হই—আবার তখনই আমার সকল কষ্ট আপনিই দূর হয়, "হরি পদ্মপলাশলোচন" বলিয়া একবার ডাকিলেই, কে যেন আসিয়া জননীর ন্যায় যত্নে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করেন! তাই বলি, আমি সমস্ত পৃথিবী বেড়াইব!—প্রাণের শঙ্কা করি না, হরি দেখা না দি'ন, অ-দেখা থাকিয়াও তিনি আমায় জননীর মত রক্ষা করিবেন—আমি এ প্রাণ থাকিতে তাঁহাকে না দেখিয়া কখনই নিরস্ত হইব না। তুমি তাঁহার সেবক, তাঁহার সংবাদ তুমি বিশেষ জান, হয় আমাকে তাঁহার সুসংবাদ দাও, যাহাতে আজই তাঁহাকে দেখিতে পাই তা'ই কর, নতুবা আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, হরি আমার হয় ত কত রাগ করিতেছেন, তোমার কথা শুনিতেছি বলিয়া। দেব! হয় সুসংবাদ দাও, নয় অন্তরিত হও—এ দুঃখিনীর সন্তানকে আর দুঃখ দিওনা।"

দেবর্ষি স্পষ্টই বুঝিলেন, এত অন্ধভক্তি-প্রবাহের প্রতিরোধ কখনই হইবে না। অবোধ শিশু বেদবিদ্যাতত্ত্বজ্ঞানদর্শনের মুখাপেক্ষী নয়। সরল প্রেম, সহজ ভক্তি, যুক্তির প্রতীক্ষা করে না। ধ্রুব পঞ্চমবর্ষীয় শিশু হইয়াও কল্পান্তজীবীর ন্যায় প্রবুদ্ধভাব পাইয়াছে!! সকলই সর্ব্বময় হরির কৃপা। আর না, আর এ পথে অযথা অন্তরায় উপস্থিত করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হওয়া কখনই বিধেয় নহে। ভক্তের মুক্তিপথ সুযুক্তি বলে উন্মুক্ত হউক, আর না। দেবর্ষি কহিলেন "ধ্রুব! আমি তোমার ভক্তি পরীক্ষার জন্য বলিতেছিলাম, তুমি অবোধ শিশু, কি করিয়া বিষম দুর্ব্বোধ তত্ত্বজ্ঞান অন্তরে অচল রাখিবে—আপাতকঠোর পরিণামমধুর ইষ্টসাধনায় কি রূপে সিদ্ধিলাভ করিবে—উপযুক্ত অধ্যবসায় ও একাগ্রতা তোমাতে সম্ভবে কি না—তাহাই জানিবার

জন্য, পরীক্ষার্থ প্রতিরোধ করিতেছিলাম। নতুবা, বৎস! যে সর্ব্বজনবাঞ্ছিত সাধুগণ-সেবিত, পবিত্র-পদবীতে তুমি পদার্পণ করিয়াছ, যে ইহামুত্রতারিণী মহতী চিন্তা তোমার অন্তরের অন্তঃস্থল আলোকিত করিয়াছে, যে সারাৎসার—পরাৎপর নাম সারজ্ঞান করিয়া, তুমি এই অজ্ঞানশৈশবে, সংসার অসারবোধে পরিহার করিয়া, অনাহারে অরণ্যে ফিরিতেছ, ধ্রুব রে! তোরে শিরে ধরে, ইচ্ছাকরে——বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশলোকে সহস্র-মুখে তোর যশের গাথা গান করিয়া বেড়াই! তথাপি তাহাতেও তোর এ অমূল্য ক্রিয়ার নিষ্ক্রয় হয় কি না সন্দেহ। আয়, আয় তবে সাধু-চূড়ামণি, আয়, তোর সাধনার পথ সরল করিয়া আজি আমার সাধু-সেবক নাম সার্থক করি। যত সহজে সে জনের চরণ দর্শনে বাসনা করেছিস, তত সহজ যে তিনি নহেন ধ্রুব! যতক্ষণ হৃদয়সরোজে সরোজাসনে, সেই সাধনের ধনের মোহনমূর্ত্তি দিব্য অঙ্কিত করিতে না পারি ভাই, ততক্ষণ তিনি যে অদর্শন ধ্রুব! আত্ম-সংযম, ত্যাগ-স্বীকার, কঠোর-ব্রতাচার, বিষয়-বিতৃষ্ণা, তপোনিষ্ঠা, সমদম-সাধন, হরিসাধনের এরাই যে সাধন ধ্রুব! অগ্রে এ সকল সাধনায় সিদ্ধ না হইলে, অনন্ত-কালের সাধনাতেও যে সিদ্ধি নাই ধ্রুব! আয় ভক্ত—যাহাতে তোর সর্ব্বসিদ্ধি ঘটে, অকপটে তবে তাহার বিধান করি। ধর, ধর, ধ্রুব, জগতের গুহ্যতম মন্ত্র কর রে ধারণ, প্রভুর পবিত্র নামে ভক্তি-দীক্ষা কর রে গ্রহণ——মুক্তিপথে মুক্তিদ্বার হউক মোচন।

কমণ্ডলুজলে দেবর্ষি ধ্রুবের সংস্কার সাধন করিয়া, শুভক্ষণে সর্ব্বলোকগুহ্য পবিত্র প্রণববীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিধানে

ধ্রুবকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। ধ্রুবের অন্তরের অন্তঃস্থল কে যেন আলোকে পুলকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল !! দেবর্ষি কহিলেন "বৎস ! যথানিয়মে অগ্রসর হও, অচিরে মনোরথ পূর্ণ হইবে, কিন্তু সাবধান, বৎস। বিস্মৃত হইওনা— ত্যাগ-স্বীকারই প্রধান-সাধন। প্রভুর জন্য প্রাণত্যাগেও কুণ্ঠিত হইওনা। মঙ্গলময় তোমার মঙ্গল করিবেন। এক্ষণে আমি অন্তর্হিত হই।" দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন। ধ্রুব, অপার সাগরে কাণ্ডারীশূন্য তরণীর ন্যায় ঘুরিতেছিলেন, দেবর্ষির মোহনমন্ত্র এক্ষণে তাঁহার কর্ণধার হইল ; নির্ভীকহৃদয়ে প্রদর্শিত বিধানের সাধন দ্বারা অভীষ্টপথে ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

৬

ধ্রুবের কঠোর তপস্যায় সুরগণ ভীত হইলেন। অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া, ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে,—প্রাণবায়ু রোধ পূর্ব্বক, অবিরোধে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু অলোকসাধারণ উৎকট অদ্ভুত— তপশ্চারণ করিতেছে !! ত্রিভুবন ধ্রুবের তপস্যায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, শিবের শিবত্ব, কিম্বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একাধিপত্য—ধ্রুব কোন্ মহত্তত্ব লাভে অভিলাসী হইয়াছে ? দেবগণ ভাবিয়া সমাকুল হইলেন। সুরপতি-ইন্দ্র বহুপরামর্শের পরে, ধ্রুবের তাপোবিঘ্ন উৎপাদনে কৃত-সংকল্প হইলেন। লীলাময়ী অপ্সরাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "যাও ভদ্রে ! মহামতি ধ্রুবের যাহাতে অকালে ধ্যান প্রতিহত

হব, যাহাতে তিনি সমাধিচ্যুত হন, অবিলম্বে সর্ব্বপ্রযত্নে—তাহার সাধন কর।” অপ্সরা রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মুহূর্ত্তে মর্ত্তে অবতীর্ণ হইল। কামচারিণী ধ্রুবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। মোহিনীবেশে মোহন-কণ্ঠে অপ্সরা মোহনসঙ্গীত ধরিল——

মধুর মলয় অনিল দোলনে,
দুলে দুলে ফুল খেলিছ কি খেলা!
ফুল্ল কামিনী ফুল্ল বদনে,
চুমিতে চামেলী ধরিছ কি গলা?
অমিয় জড়িত দামিনী চমকে,
হাসি হাসি ওকি গাহিলিরে বেলা!
লোলুপ মধুপ উধাও ধায়িছে!
বাঁধিতে বঁধুয়া পাতিলি কি ছলা?

অগ্নি-পরিখা নিবীড় ধূমাচ্ছন্ন, মধ্যগতমূর্ত্তি দৃষ্টই হইল না। অপ্সরা আবার গাহিল,——

ঝঙ্কারে পিকবর, পঞ্চমে মাতইয়ে
গাহইছ কি গুণ তুঁহারি!
ধীরে মধুর তানে, গুঞ্জরি বঁধুয়ায়ে
করইতু ভ্রমরা গুহারি।

প্রতিঘাত বাজিবে কোথায়? অগ্নিমধ্যে ধূমপুঞ্জ ভেদ করিয়া অপ্সরা অস্পষ্ট দেখিতে পাইল, যোগাসনে নিষ্পন্দ মূর্ত্তি। অপ্সরা আবার গাহিল,—

সবঁহি বিষাদ ভেল
অয়ি লো পরাণ সই,
আঁখি মম পেখই আঁধার !
কাঁহা বিরাজই নাথ,
নিদেশ মিলল নহি,
সার ভেল নয়ন আসার !!

অপ্সরার নয়নে এ বার প্রতিভাত হইল,—দিব্য মোহন মূর্ত্তি নবিনযোগী! লীলাময়ী অপ্সরা, অগ্নি-কুণ্ডের সমধিক নিকটে গিয়া, সমধিক মধুরে আপনার মন আপনি মোহিয়া আবার গাহিল ;—

জাগ জাগ!——মধুর মোহন
যোগ-জীবন যোগী—
জগজনমন মোহন—মধুরে
কাঁহে তু কহ বিয়োগী—
যোগানন্দে সাধই যায়—প্রেমানন্দে মিলল তায়,
সাধু হৃদিধন—সাধন রতনে
অবঁহি আওরে ভোগী॥

প্রজ্বলিত অনলরাশির মধ্য হইতে, তড়িৎ বেগে, মোহন মূর্ত্তি বাহির হইল—অদ্ভুত প্রেমিক—আশ্চর্য্য যোগী—যৌবন কৈ ?—দুগ্ধ-পোষ্য শিশু !—অপ্সরা বলিল "হরি ! হরি !" মূর্ত্তি

চিত্রফলকবৎ অপ্সরাচরণে আসিয়া পতিত হইল! গদ্গদস্বরে মূর্ত্তি বলিল "হরি! হরি! হরি!——" লীলাময়ী অপ্সরার হৃদয় যুগপৎ বিস্ময়ে ও ভয়ে স্তম্ভিত হইল! অভিলসিত কলুষিত বাসনা—হাব ভাব কটাক্ষ ও মোহিনী ছলনা—মুহূর্ত্তে একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। নবীনপ্রসাদে হৃদয় প্রসন্ন হইল! লীলা-ময়ী—বাৎসল্য-স্নেহে জননীর ন্যায় স্নেহময়ী—প্রেমময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। শিশু-ধ্রুবের কঙ্কালসার মূর্ত্তি ক্রোড়ে করিয়া, স্নেহ-ভক্তি-পূরিত মনে সকরুণে স্তন্য দান করিতে লাগিলেন! জীবন্মৃত সাধকশিশু অমৃতপানে স্নিগ্ধ ও সঞ্জীবিত হইয়া, অল্পে অল্পে নয়ন উন্মিলন পূর্ব্বক সতৃষ্ণে লীলাময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল;—

এত দুঃখ—এত কষ্ট—যন্ত্রণা—লাঞ্ছনা!
দুঃখময় ধরা—কেন সৃজিলে শ্রীহরি!
তুমি সৃষ্টি—তুমি স্থিতি—তুমি গতি লয়!—
অগতির গতি দানে কাতর শ্রীহরি?
নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়—অতি কঠিন হৃদয়!—
এত কালে কোলে তুলে নিলে কি শ্রীহরি!
দেবর্ষি করুণা ক'রে দেখা'লেন পথ,
তাই ত তোমার দেখা পে'লাম শ্রীহরি!
মনে নাই—কতদিন গত হ'ল বনে!
মনে নাই—কতদিন ব'সেছি সাধনে!

মনে নাই—কি বিষাদে সাধনা আমার!
মনে নাই—জননীর স্নেহ মূর্ত্তি আর!!
এত দিনে হ'ল দয়া, দেখা দিলে হরি!
এত দিনে কোলে তুলে নিলে কি শ্রীহরি?
হরি! হরি! কই হরি! সে রূপ মোহন—
শঙ্খ—চক্র—গদা—পদ্ম-পলাশলোচন!!!

লীলাময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন;—ধন্য বৎস! তুমি ধন্য ভুবন মাঝারে। অদ্ভুত অনন্তকীর্ত্তি রাখিলে সংসারে। হরি-ধ্যান হরিজ্ঞান হরি প্রাণমন, হয়নি হবেনা বিশ্বে তোমার মতন। সার্থক এ পাপদেহ আমা'র এখন! পবিত্র পরশে ধন্য হ'ল এ জীবন! বৎস! আর কেন আমায় লজ্জা দেও? আর কেন হরিমুখ প্রাণে এ পাপিনীজনে হরিভ্রমে সম্বোধন কর! বাছা রে, আমি তোর হরি নই; দেবসভার নৃত্যকী মাত্র—আমি অপ্সরা।—ধ্রুব! তোমার কঠোর তপস্যায় ত্রিভুবন স্তম্ভিত হই-য়াছে! দেবগণ ভীত হইয়া, অকালে কলুষভাবের অবতারণা করিয়া তোমার ধ্যানভঙ্গ জন্য, আমাকে তোমার নিকট পাঠা-ইয়াছিলেন—আমি তোমার পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া একবারে মোহিত হইয়াছি!—আজি হইতে, আমি সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া তোমার অভিষ্টপথের অনুসারিণী হইলাম। ঘৃণিত সাংসারিক-বাসনা বিষবৎ পরিত্যাগ করিলাম। ধ্রুব! যাহাতে আমার পারত্রিক রক্ষিত হয়, তাহার বিহিত বিধান কর। আমাকে ক্ষমা কর ধ্রুব, আমি মহাপাপিনী—তোমার অকল্যাণের চেষ্টা করিতে আসি-

য়াছিলাম। ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। তোমার হরি তোমাকে এ বিপদে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এ পাপিয়সীকে ক্ষমা করিতে হইবে ধ্রুব—তুমি নিরাপদে অগ্রসর হও, অচিরে তোমার বাসনাসিদ্ধি হউক—আমি তোমার করুণাভিখারিণী।” লীলাময়ী ধ্রুবকে অঙ্ক হইতে সন্তর্পণে ভূমিতে রক্ষা করিয়া, কয়েকপদ দূরে, প্রসাদপ্রতীক্ষায় সভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ধ্রুব, মৃদু-মধুর—অপরিস্ফুট, হতাশব্যঞ্জক গদ্‌গদস্বরে কহিলেন “ভয় নাই ভদ্রে; পদ্মপলাশলোচন হরি তোমার ভয়-ভঞ্জন করিবেন—তুমি অন্তর্হিত হও।”

অপ্সরা অন্তর্হিত হইল। ধ্রুব অগ্নি-বেষ্টনের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। মধ্য-বেদীতলে যোগাসনে আসীন হইয়া করপুটে করুণকণ্ঠে গাহিলেন ;—

জীবনের যত সাধ, রহিল জীবনে, হরি।
এ জনমে হ’ল না পূরণ!
আশায় বঞ্চিত প্রাণ, কিকায ধরিয়ে, হরি!
পাপদেহ করিব পতন।
দুঃখে জন্ম হয়েছিল, দুঃখে দি’ন গত হ’ল
চিরদিন দুঃখানল জ্বলিল সমান, হরি!
চিরদিন—জ্বলিল সমান।
না মিলিল সুখভোগ অভাগা কপালে হরি!
না পে’লাম জুড়াবার স্থান!

বড় আশা ছিল মনে, এ জীবন পণে, হরি !
ও চরণে হইব মিলন।
নিহারি নয়ন ভরি, ওরূপ মাধুরি, হরি !
—হরি পদ্মপলাশলোচন !
অনশনে একাসনে, অনুদিন কাঁদি, হরি।
অন্বেষণ করি বনেবন।
না পে'লাম তবু দেখা, অ-দেখা নিদয়, হরি !
মন দুঃখে চাহিনু মরণ !
দেব-ঋষি স্নেহ বশে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে, হরি !
শিখা'লেন বিহিত সাধন।
অনুরূপ পথ ধরি, অনুপ ওরূপ, হরি !
এতদিন করিনু চিন্তন !
কলেবর অস্থিসার, হইল সাধনে, হরি!
সমাসন্ন হইল নিধন !
বিপন্ন হে বিধিমতে, তবুও নিদয়, হরি !
তবুও দিলে না দরশন !
যত ছিল মনে আশা, মনেই রহিল, হরি !
জ্বলিল—হতাশ হুতাশন !
কি কাজ বল না আর, এ ছার জীবনে, হরি
বল বল কিবা প্রয়োজন—

প্রজ্বলিত হোমবহ্নি, জ্বলিছে ভীষণ, হরি!
আর কেন—হই হে পতন!
এ সময় দয়াময়, অসময় এস, হরি!
একবার দেহ দরশন!
জন্মের মত এই, হইব বিদায়, হরি!
জন্মশোধ করি আবাহন,
সাধনের ধন ওই, রাঙাপা দুখানি, হরি!
একবার দেখাও এখন!
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশরেখা বাতুল চরণ, হরি!
বনমালা কৌস্তুভ ভূষণ—
ভৃগুপদ চিহ্ন বুকে, বঙ্কিম নয়ন, হরি!
শিখীপুচ্ছ শিরেতে ধারণ—
মোহন মুরলী ধারী ভুবন মোহন, হরি!
ভক্ত-জন-জীবন-রঞ্জন!
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-পলাশলোচন, হরি!
মৃত্যুকালে দেহ দরশন!!!

জনপ্রাণীসমাগমশূন্য গভীর অরণ্যস্থলীর মধ্যস্থিত ভীষণ অগ্নি-বেষ্টনের মধ্যে যোগাসনে বসিয়া, কৃতাঞ্জলীপুটে কাঁদিতে কাঁদিতে ঊর্দ্ধমুখে, ধ্রুব, এই পাষাণ-ভেদী করুণসঙ্গীত গগন-ভেদ করিয়া গাহিলেন।

আবার ধৈন কাহারও অপেক্ষায় কিয়ৎক্ষণ নিঃস্তব্ধ-স্তম্ভিত রহিলেন,—মুহূর্ত্তে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ভীষণ উচ্ছ্বাসে গাহিলেন;——

"কই—কই হরি! কোথায়—কোথায়—
এলে না—দিলেনা দরশন?
এত ক'রে প্রাণভ'রে—সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে
বারে বারে মৃত্যুকালে করি আবাহন—
একবার দিলে না দর্শন?
নিষ্ঠুর নির্দ্দয় প্রাণ—পাষাণে বাঁধিলে প্রাণ
হরি—পদ্মপলাশলোচন!!

হরিময়-প্রাণ ধ্রুব, তখনি আবার সাধনার চক্ষে সমস্ত হরিময় দেখিলেন। মুহূর্ত্তপরে, ধ্রুব, বলিলেন,—

ওকি! ঐ যে! ঐ—ঐ—ঐ কি সেইরূপ! আমরি মরি! ঐ যে হরি আমার! পদ্মপলাশলোচন হরি ঐ যে! ত্রিভঙ্গভঙ্গিম নটবর শ্যামরূপ—নবদূর্ব্বাদল—নবজলধরদল শ্যামরূপ! মরি মরি! কি মাধুরি রে! অধরে মধুর হাঁসি—শ্রীকরে মোহন বাঁশী—কি মাধুরি রে! হরি! পদ্মপলাশলোচন হরি আমার! এতক্ষণ কোথা ছিলে হরি! জীবনান্ত কালে কি দেখা দিতে এলে হরি! এস!—সম্মুখে এস!—হৃদ্‌পদ্মে একবার এস হরি! ওকি! ওখানে হরি আমার! বৃক্ষতলে হরি আমার—শাখার অন্তরালে হরি আমার! মাধবীলতায় জড়িত ঐ লতাকুঞ্জে হরি আমার!

ঐ কেতকী কুসুমে কণ্ঠকাসনে, সুখাসনে ব'সে হরি আমার! ঐ অনাবৃত উত্তাপে—ঐ শীতল শিলামণ্ডপে—ঐ দূরে—ঐ অদূরে—ঐ পার্শ্বে—ঐ পশ্চাতে—সম্মুখে—উর্দ্ধে——হরি হরি!! যে দিকে দেখি সর্ব্বদিকে সর্ব্বময় হরি! তাই ভক্তবৎসল তোমায় বলে!—তাই ভক্তপ্রাণ ভক্তাধীন তোমায় বলে হরি!—কে তোমায় নিষ্ঠুর আর বলিবে প্রভু! তুমি দয়ার সাগর, তুমি স্নেহের সাগর, তুমি শান্তি দাতা, তুমি নিখিল নিয়ন্তা! তুমি পাতা! তুমি পিতা! তুমি মাতা! তুমি মমতা! তুমি আমার এত দিনের সাধনের ধন ব্রহ্মসনাতন পদ্মপলাশলোচন হরি!! তোমায় কোটী কোটী অসংখ্য কোটী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি—পরিত্রাণ কর হরি!!!——ধ্রুব ধরা লুটাইয়া সম্মুখে প্রণাম করিলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া করপুটে—স্তব করিতে উঠিলেন। উঠিয়া দেখিলেন, হরি হরি!! কই হরি! কোথায় হরি! ধূ-ধূ অগ্নিকুণ্ডে ঘেরিয়া ভীষণ অগ্নি জ্বলিতেছে! চারিদিকে শুধুই হোমাগ্নি-বেষ্টন ধূ-ধূ জ্বলিতেছে! জন-প্রাণীশূন্য নিবীড় নিস্তব্ধ অরণ্য কেবল উত্তাপে ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে!! কেহ কোথাও নাই। কোথায় হরি!—ধ্রুব, একাকী অগ্নিমধ্যে করপুটে দণ্ডায়মান!!!

চৈতন্য সঞ্চার হইল। চিত্রপুত্তলিকাব ন্যায়, ধ্রুব, স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পরিশেষে কাঁদিয়া ফেলিলেন——এতদিনের পর আজি দুঃখিনী বনবাসিনী জননীর কথা মনে হইল। স্নেহময়ী জননীর কঙ্কালসার মূর্ত্তি মনে পড়িল; মা ঘুমাইতেছিলেন—তিনি অঙ্কশূন্য করিয়া, দুঃখিনীকে বনের মধ্যে নিঃসহায়ে কুটীরে একাকিনী

ফেলিয়া আসিয়াছেন;—জন্মের মত কাঁদাইয়া—অকূলসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে মণিহারা ফণিনীর স্থায় জননী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—মর্ম্মভেদী স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—ধ্রুব কাঁদিয়া ফেলিলেন! কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া, জননী-মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, সকরুণে কহিতে লাগিলেন,—হায়! হায়! দুঃখিনী বনবাসিনী জননী আমার! ওমা—স্নেহময়ি! মা—ওমা—মা আমার! আছ কি মা এখনো জীবনে—হতভাগ্য ধ্রুব শোকে আছে কি মা প্রাণ? কি পাষাণ আমার হৃদয়—বিস্মৃত মা একবারে হয়েছি তোমায়! মা-গো-মা, না জানি কত—কত কষ্টে কাটিছ যামিনী! অনাহারে ধরাসনে শয়নে স্বপনে পুত্রমুখ হৃদয়েতে হ'তেছে উদয়। কাঁদা'তেছ বন! কে আছে সান্ত্বনা দানে তুষিবে জীবন! বনে বনে ফিরে ফিরে পাগলিনী প্রায়, আকুলিত হ'য়ে কি মা শুয়েছ ধরায়? হা ধিক্ সন্তান আমি!—বিমাতার কথা শুনে, মত্ত হ'য়ে অভিমানে তবপ্রাণে ব্যথা দিয়ে হয়েছি বিদায়!—অপরাধ কর ক্ষমা দেখা দে মা স্নেহময়ি বিপদ সময়! ক্ষুধায় আকুল বনে মরি গো তৃষ্ণায়—অসময়ে একবার দেখা দে আমায়!! দুঃখিনি, বন বাসিনি, জননি আমার! মৃত্যুকালে কোলে নে আমায়—আয় মা গো—আয়——

বলিতে বলিতে ধ্রুব আবার উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। দুঃখ-শোক-জীর্ণা কঙ্কালমাত্রাবশেষা বিশীর্ণা জননী-মূর্ত্তি যেন ধ্রুবের সম্মুখে উপস্থিত! যেন, সেই মধুর মূর্ত্তি—সেই নিরাশা-ব্যঞ্জক মধুর হাসি—সেই সস্নেহ সতৃষ্ণ দৃষ্টি—সেই দুঃখের ডালি

ধরিয়া ধ্রুবের সম্মুখে উপস্থিত! সেই শতছিন্ন-জীর্ণ-মলিন বসন পরিধানে—সেই অযত্ন-রক্ষিত-রুক্ষ-কেশজাল মস্তকে—দীনা হীনা ক্ষীণা মলীনা শীর্ণস্বর্ণলতা, মূর্ত্তিমতী স্নেহ ধ্রুবের মাতা, ধ্রুব দেখিলেন, যেন—সম্মুখে!—ওকি! মা! মা-আমার এলে কি! ধ্রুব উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিলেন—মাগো!—দুঃখিনি, বনবাসিনি, মা-আমার গো! দুঃখ দূর হ'ল না মা। মনের আশা মনেই রহিল মা! এ জীবনে সাধনা হলো না মা! এ জনমে আশার সুসার হলো না মা!—স্নেহময়ি, মা-আমার! জননি! স্নেহ ভরে তেমনি ক'রে একবার কোলে নাও মা—একবার আমায় তেমনি ক'রে কোলে তুলে নাও মা! জন্মেরমত তোমার স্নেহ নিয়ে যাই—জন্মেরশোধ বিদায় নিয়ে যাই—বিদায় দাও মা—মনের আশা মনেই রহিল! হ'ল না—হরি সাধন হ'ল না। হরি—পদ্মপলাশলোচনহরি, সদয় আমায় হ'লেন না—দেখা আমায় দিলেন না। কৈ তবে দুঃখ ঘুচিল মা! মনের দুঃখ প্রাণের দুঃখ আমাদের তবে কৈ ঘুচিল মা! আমি চলিলাম—বিদায় দাও মা! আবার যাই—যথা ইচ্ছা যাই মা! তুমি বনবাসে মুনিগণের আবাসে মুনিগণের আশ্রয়সহায়ে রহিও মা! তেমনি ক'রে ভিক্ষান্নে প্রাণ ধরিও মা! কখনও মহারাজার আশ্রয়ে আর যেও না মা! কালসাপিনী সতিনী যেখানে, সেখানে কখনও যেওনা মা! সেই কালসাপিনী মহারাণী মিথ্যা আমায় বলেছিল—হরি পদ্মপলাশলোচন দুঃখ হরণ করিবেন। তুমিও মিথ্যা বলেছিলে মা—হরি পদ্মপলাশ-লোচন দুঃখ হরণ করিবেন; আর গুরুদেব দেব-ঋষি তিনিও মিথ্যা বলেছিলেন মা—অচিরে হরি সদয় হবেন—হ'ল না! তা হ'ল না!

নিষ্ঠুর-নির্দ্দয়-হরি সদয় আমায় হ'লেন না! কৈ ?—রহিলেন এখনও ভুলিয়া। হা-একি! একি! রাজসভা! ও কে আসে—সুরুচি জননী ? মহারোষে হেন বেশে সভাস্থলে কেন ? মহারাজ, কেন মহারাজ নামালে আমায় ? সিংহাসনে দিলেনা বসিতে—কোলে তুলে নিলে না সন্তানে—দিলে না এ দীনে সোহাগের ভাগ !—দীননাথ আছেন আমার! তাঁর স্নেহ পাইব এখনি! সোহাগে আদরে তিনি লইবেন কোলে—দয়াল আমার হরি! দয়া করি দীনহীনে দুঃখিনী-সন্তানে দিবেন আসি শ্রীপদ তরণী—করিবেন পার। হরিপদ্মপলাশলোচন ভিন্ন অন্য গতি নাই আর, হরি—হরি—হরিনাম মধুর মধুর! কাজ কি আমার, অন্য আর, বিষয় বাসনা! রসনা রে! অবিরাম হরিনাম কর উচ্চারণ—এ জনমে জনমের মত জীবনের পূরাও কামনা। বল মন, মনে মনে সুধাময় হরিনাম! ধ্যানে জ্ঞানে ভাব সে ভাবনা! সাধনে সাধ সে নাম! রসনা রে! অবিরাম সুধাময় হরিনামে রস না রে রস না!—প্রাণ! মিলাইয়ে প্রাণে প্রাণে, সুধাময় তানে মানে সুধাময় হরিনাম গাও না রে গাও না। কি ছার জীবনে তার, প্রয়োজন বল আর—সুধার সু-ধার নাম হরিনামে, অবিরাম, মন প্রাণ মাতাইতে চিত যার চায় না। হরি সৃষ্টি—হরি স্থিতি—হরি মতি—হরি গতি—হরি বই—অন্য কই—কে আমার বল না ? শয়নে স্বপনে হরি—জীবনে মরণে হরি—হরিহীন শরীরীর শরীর ত বয় না—স্থিরমনে ধীরপ্রাণে—সুধাময় তানে মানে সুধাময় হরিনাম গাও না রে গাও না—গাওরে উধাও—গাও——

ধ্রুব আত্মহারা হইয়াছেন—হরিনামে। সেই উন্মত্ত-আত্ম-

হারা প্রাণে, সেই সুধাময় হরিনাম, সুধাময় তানে ত্রিভুবন মন মাতাইয়া গাইতে লাগিলেন;——

জাগ জাগ বিশ্ব!—গাও হরিনাম!
বিশ্বনাশী—কাল্
জাগিছে করাল
মহা-ব্যোম-রূপে
মিলাতে স্ব-রূপে
বসিল্ শিয়রে ওই!
মহা-ব্যোম-রূপে হইবে মিলিতে
এখনি—ক্ষণেক বই!

উঠ জাগ বিশ্ব!—গাও হরিনাম!
যে নামেরি গুণে,
যাঁহারি—চরণে,
ভীষণ—সঙ্কটে
সে ভীষণ ক্ষণে
আনন্দ-আশ্রয় পাবে!
তুমুল প্রলয়ে—ভীম একার্ণবে
অক্ষয় অব্যয় র'বে!

কাঁদিছে চৈতন্য সুষুপ্তি আঁধারে—
অচেতনা কোলে
প্রজ্ঞা প'ড়ে ঢ'লে,
খেলিছে—স্বপন,
হাসে—প্রলোভন.
কলুষ ঢালিছে সুধা !!
জাগ জাগ বিশ্ব গাও "হরি হরি"
ঘুচাও ঘুচাও—ধাঁধাঁ।
"হরি—হরি—হরি" গভীর গরজে
মধুর—সম্পাতে
ঘাতে প্রতিঘাতে
মোহি প্রাণ—মন
বিশ্ব—বিমোহন
উঠুক নামের—ধ্বনি
জাগুক ব্রহ্মাণ্ড—চেতুক পাতকী !
নীরবে—নিথরে
ধীরে-ধীরে-ধীরে
আত্ম তেয়াগিয়ে
উধাও—ধাইয়ে
ছাড়ুক আঁধার—প্রাণী !!!

আয় চল্ মন পুলকে—আলোকে
নামের যেখানে খণি।

আবেগের সংবেশে, তন্ময় উচ্ছ্বাসে, তন্ময় সাধক সহসা শিহরিয়া উঠিলেন! দেখিলেন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম—চতুর্ভুজ! ধ্রুব শিহরিয়া উঠিলেন!—অদূরে অগ্নির বাহিরে ত্রিভঙ্গমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া—শ্রীহরি! অজ্ঞান—বিহ্বলহৃদয়ে শ্রীমূর্ত্তি-লক্ষ্য করিয়া চকিতের ন্যায় ধ্রুব, বাহিরে আসিয়া পড়িলেন, তন্ন তন্ন কত অন্বেষণ করিলেন—কৈ আর মূর্ত্তি শ্রীহরি! অগ্নির অদূরে ধ্রুবের যোগবেদীর উপর যোগাসনে মূর্ত্তি—আবার ও কি ঐ শ্রীহরি। ধ্রুব উল্লম্ফনে মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন—শূন্য বেদী! ঐ অগ্নির বাহিরে, বেদীর অগ্নিকোণে, অদূরে—ঐ যে ঐ আবার সেই শ্রীহরি! তড়িৎ গতি ধ্রুব আসিয়া দেখিলেন—শূন্য—শূন্যময়! সেথানে ত নয়, ঈশানে দাঁড়াইয়া হাসিছেন শ্রীহরি! ধরি ধরি, ধ্রুব—ধরি ধরি করি, হোম-বহ্নিকুণ্ড ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অধীরে খুঁজিছেন শ্রীহরি! বিদ্যুতের ন্যায় আসে যায় মূর্ত্তি! এই আগে হরি—এই পাশে হরি—পশ্চাতে—সম্মুখে, উর্দ্ধে অধোতে, ধ্রুবের নয়নে বিদ্যুৎবিকাশে প্রকাশে হরি! ধ্রুব, ধরি ধরি, ঘুরিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইলেন; অগ্নিকুণ্ডের বাহিরে অদূরে, ধ্রুব বসিয়া পড়িলেন! আবার ধ্রুব পূর্ব্ববৎ দেখিলেন, যেন গগণেরপটে সারি সারি সারি, অনিলেরগায় মিলে মিশে হরি, লতায় পাতায়, শাখা-প্রশাখায়, পাদপের গায়, ফলে ফুলে জলে, তরুমূলে তলে, সর্ব্বস্থলে, সেই সর্ব্বময় হরি! সর্ব্বময়ের বিশ্বরূপ দেখিয়া ধ্রুব স্তম্ভিত হইলেন—যে

দিকে নেত্রপাত করেন—দাঁড়াইয়া ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি শ্রীহরি!! ধ্রুব, এ দিক—ও দিক—সে দিক—ফিরিয়া ঘুরিয়া, অবনতমস্তকে অনবরত প্রণাম করিয়া করিয়া—ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। নয়ন মুদিয়া ধ্রুব যোগাসনে বসিলেন, দেখিলেন—চকিতের ন্যায় আসিয়াই মিলাইয়া গেল—হৃদয় ফলকে শ্রীহরি! শশব্যস্তে ধ্রুব নয়নোন্মিলন করিলেন, হরি! হরি! হরি! কৈ আর সে রূপ বিশ্বময় হরি! ত্রিভঙ্গভঙ্গিম কই আর শ্রীহরি! যে দিকে দেখেন, কোথাও সে রূপ নাই! এ কি? ভীষণ অরণ্যে ভীষণ অগ্নিকুণ্ড-পার্শে, ধ্রুব একাকী—দণ্ডায়মান!!—এতক্ষণ কি স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন? অধীরে—কাতরে—অজ্ঞানে, এখানে—সেখানে, ওখানে তন্ন তন্ন করিলেন—শেষে অগ্নিকুণ্ডের বাহিরে অদূরে গিয়া, ধ্রুব, বৃক্ষমূলে বসিলেন। আবার তখনি উঠিয়া বৃক্ষশাখা দিয়া সমস্ত অগ্নিবেষ্টন একত্র করিলেন। মধ্য-বেদীর উপর—অগ্নি স্তূপাকার হইল—ভীষণ অগ্নি ধূ-ধূ—প্রজ্বলিত হইল!

চৈতন্য হইল!—আর জীবনে কি ফল? বিফল জীবন বিস-র্জ্জন দিতে—পাপদেহ ভস্মশেষ করিতে, ধ্রুব, কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় অগ্নির সম্মুখে করপুটে দাঁড়াইলেন। সাধনের ধনের সেই মোহনমূর্ত্তি হৃদয় ভরিয়া ভাবিয়া লইলেন।— ধূ-ধূ ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল!! আত্মহারা ধ্রুব, বার বার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। সংজ্ঞাশূন্যপ্রায় মহাবেগে উচ্ছ্বাসে অগ্নি-কুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিলেন!

হা! একি হ'ল! হা! এ কি পরিতাপ! হরি হে! করুণা-নিদান হরি হে! প্রভু হে! তোমার মিলন পথ এতই কি কঠিন? এততেও সদয় হ'লে না? এততেও ধ্রুবকে দেখা

দিলে না?—হতাশে সন্তাপে মহাবিপন্ন শিশু, তোমারই বিরহে অধীর—আত্মহারা হ'য়ে অগ্নিকুণ্ডে শেষে ভস্মশেষ হল? সাধক! সহৃদয় পাঠক! ওকি বলিতেছ? ওকি ভাবিতেছ? তাও কি সম্ভবে? তা হ'লে তবে "করুণানিদান—ভক্তবৎসল" নামে প্রভুকে ডাকিব কেন? ও—ই দেখ! ওই—ওই, সেই অগ্নিময়কুণ্ডে চাহিয়া দেখ,—কই সে অগ্নি কই? কই সে ভীষণ প্রজ্জলিত অগ্নি? ধ্রুবের চিতা বহ্নি কই? কই ধ্রুব কই!!———একি! একি! মরি মরি! কি মধুর—আমরি মরি! ওই দেখ সাধক! ওই—ওই মহাশূন্যে—সুখাসনে, কার অঙ্কে বসিয়া ধ্রুব? ধ্রুব—ও-ই! ধ্রুব অমৃত পান করিতেছেন ও-ই! কে অমৃত দিতেছেন?—কোলে বসাইয়া পদ্মহস্তে ধ্রুবের অশ্রুমার্জ্জন করিতেছেন—ধ্রুবের অধরে অমৃত ধারা দিতেছেন—সান্ত্বনা করিতেছেন—কে উনি ওই?———ওই ধ্রুবের সাধনের—ধন——শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম——চতু-র্ভুজ--পদ্মপলাশলোচন হরি!

৬

অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা করিয়া, সাদরে সোহাগে, সর্ব্বময় হরি ভক্তকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিলেন। ধ্রুবের ঐহিক পারত্রিক উভয় জীবন পবিত্র আলোকে আলোকিত হইল, ধ্রুব সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, ত্রিভুবনে প্রতিধ্বনিত হইল। মহারাজ উত্তানপাদ কৃতার্থমন্য হইয়া ধ্রুব ও সুনীতিকে গৃহে আনয়ন করিলেন। সুরুচীপুত্র উত্তম, ধ্রুবের সাধনা ও সিদ্ধি দর্শনে অসূয়া-

পরবশ হইয়া, বন প্রবেশ করেন—শার্দ্দূল—কবলে তাঁহার সাধনার সমাধা হয়। সুরুচী পুত্রবিয়োগে বিধূরা হইয়া তদন্বেষণে বনগমন করেন। তিনিও রাজ্যে আর প্রতিগমন করেন নাই। হরি, ভক্তচূড়ামণি সাধকবর মহাত্মাধ্রুবকে ঐহিক সুখের পরাকাষ্ঠা প্রদান করিলেন। মহাভাগ্যবতী সুনীতির সহিত, ধ্রুব, ষড়ত্রিংশ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ-বিভব সম্ভোগ করিলেন। ধ্রুবের চরমে, হরি, যে সুখসম্পদের বিধান করিলেন———স্মরণে পাষণ্ড জনেও হরির প্রতি আত্ম সমর্পণ না করিয়া তিষ্ঠিতে পারেনা। ইন্দ্রত্ব শিবত্ব ব্রহ্মত্ব একাধিপত্য সমস্ত সম্পদের উপর সর্ব্বাধিপত্যে, সর্ব্বলোকের উপর, বিমলালোক-পূর্ণ, দ্বিতীয়গোলক ধ্রুবলোক সৃষ্ট হইল। অন্ধ ভক্তিবলে——ধ্রুব ভগবান হরির অনুরূপরূপে পুলকে আলোকে 'তন্ময়ত্ব' পাইয়া, অনন্ত ব্যাপিয়া 'অনন্ত অক্ষয়' সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম ভাব।

যে মহাত্মার অলৌকিক সাধনা শক্তি, একদা বঙ্গবাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, যাঁহার সুধাকণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর হরিনাম সুদূর কন্যাকুমারী হইতে নগাধিরাজ হিমালয় পর্য্যন্ত ধ্বনিত করিয়াছিল, যাঁহার প্রদত্ত পবিত্র হরিনাম, একদা, বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধবণিতার কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইত, যাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশ্বজনীনভাব উপলব্ধি করিয়া, একদা, বৈষ্ণব সম্প্রদায় হরিনামের শান্তি-নিশান উড়াইয়াছিল সেই মহাত্মা চৈতন্যের

জীবন—চরিত "হরি-সাধনের" অন্তর্ভূত হওয়া, অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যিনি নিস্বার্থ নিষ্কাম ভাবে জীবগণের পরিত্রাণের জন্য স্বীয় জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, যিনি জগতের সর্ব্বত্র হরিনাম বিলাইয়া হরিগুণ গাইয়া বেড়াইয়াছিলেন, জীবের পরিত্রাণচেষ্টা যাঁহার ব্রত ছিল, তাঁহার পবিত্র চরিত্র আলোচনা করা হিন্দু মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি হরিনাম বিলাইতে গিয়া আত্মজীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন, যিনি কাণ্ডজ্ঞানহীন জঘণ্য নীচবংশীয় মূঢ় চণ্ডালাদি জাতিকে সথাভাবে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছিলেন, যিনি স্বীয় জীবনের বিনিময়ে পাপীকে হরিনাম উচ্চারণ করাইয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্র—বঙ্গবাসীর হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে অক্ষয় অক্ষরে প্রদীপ্ত থাকা উচিত। চৈতন্য—যিনি চৈতন্যবলে তুচ্ছসংসারবাসনা তৃণ-তাচ্ছিল্লে চরণে দলিয়া অত্যুচ্চলক্ষ্যে অকূলে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পবিত্র-চরিত্র পবিত্র-নাম বঙ্গবাসীর জপমালা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার পবিত্র চরিতামৃত শ্রবণ করা মানব মাত্রেরই, বিশেষ হিন্দু মাত্রেরই, অবশ্য কর্ত্তব্য।——

১

১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের অন্তঃপুর আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ। পুরাঙ্গনা গণের আনন্দপূর্ণদৃষ্টি, বিদ্যুৎচমকের ন্যায়, ইতস্ততঃ বিভাসিত হইতেছে। জগন্নাথের দশটী পুত্রের মধ্যে আটটী মৃত্যুমুখে পতিত; তাই পুরবাসিনীগণ জগন্নাথ দেবের একটী দীর্ঘজীবী পুত্রের

আশায়, সানন্দে, সূতিকা দ্বারে উপস্থিত। কিয়ৎকাল পরে সূতিকাগার প্রদীপ্ত করিয়া জগন্নাথের একটী পুত্র সন্তান হইল। সমাগত রমণীমণ্ডলীতে বিষম হুলুধ্বনি পড়িয়া গেল। সতীদেবী নবজাতপুত্রমুখ দর্শন করিয়া ভীষণ প্রসবযন্ত্রনা বিস্মৃত হইলেন। এইদিনে পূর্ণিমায় চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছিল, এবং কুমারের জন্মকালে চারিদিকে নানাবিধ মঙ্গল-সূচক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হইয়াছিল, এই সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই বিবেচনা করিলেন—নবজাত কুমার অতি সুলক্ষণাক্রান্ত—ইনি কোন প্রধান ব্যাক্তি হইবেন।

ক্রমে, কুমার বয়োবৃদ্ধির সহিত বর্দ্ধিতাবয়ব হইলেন। যথাকালে কুমারের নাম "চৈতন্য" রাখা হইল। * চৈতন্য পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে প্রেরিত হইলেন। গঙ্গাদাস, ছাত্রের অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে বিমোহিত হইলেন। তিনি চৈতন্যকে যাহা শিক্ষা দেন, চৈতন্য তৎক্ষণাৎ তাহাই শিক্ষা করেন। সপ্তম বৎসরের মধ্যে চৈতন্য গুরুর তাবত বিদ্যা একরূপ আয়ত্ত করিলেন। জগন্নাথের সন্তান দশটী, তন্মধ্যে আটটী শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়। চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ, বিশ্বরূপ, সংসারের মায়াবন্ধন ছেদন করিয়া দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করেন, সুতরাং, চৈতন্যই পিতামাতার একমাত্র অবলম্বনস্থল হইলেন। এ দিকে চৈতন্যের পঠদ্দশাতেই জগন্নাথের মৃত্যু হইল। তখন একমাত্র চৈতন্যই সংসারের তাবত ভার বহন করিতে

* কেহ কেহ বলেন, শচীদেবী নিম্ববৃক্ষতলে চৈতন্যকে প্রসব করেন। এইজন্য তাঁহার নাম নিমাই হয়।

লাগিলেন। চৈতন্য এই সংসার-স্রোতে ভাসমান হইয়া নিতান্ত বিপন্ন হইলেন। তিনি পরিবার বর্গের অবলম্বন, কিন্তু, তাঁহার আর অবলম্বন নাই। তখন তিনি বিবাহ করিয়া নিজের অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সুখে দুঃখে সমভাগিনী করিতে বাসনা করিলেন। সুলক্ষণাকন্যার অন্বেষণ করিতে চারিদিকে ঘটক প্রেরিত হইল। বহু-অন্বেষণের পর, বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত চৈতন্যের বিবাহ হইল। লক্ষ্মীদেবীর পবিত্র প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া, চৈতন্য, সংসারের জ্বালা যন্ত্রনায় কিয়ৎপরিমাণে শান্তি পাইলেন। এত দিন অকুলসংসারসাগরে ভাসমান ছিলেন, এখন সেই অকুলে যেন অবলম্বন পাইলেন। লক্ষ্মীদেবী স্বামীর সুখদুঃখভাগিনী হইয়া, একান্তমনে স্বামীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন। উপযুক্ত স্ত্রীর পবিত্র প্রণয়, সংসারে শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। চৈতন্য, ভাগ্যক্রমে লক্ষ্মীস্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীকে, সংসার-বিষের একমাত্র মহৌষধরূপে, পত্নীত্বে-প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বিংশতিবৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইল।

একদা, পুরবীর নামক একজন পরম বৈষ্ণব, চৈতন্যের গৃহে অতিথি হন। পুরবীর চৈতন্যের অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে মোহিত হইলেন। একে চৈতন্য বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বংশজাত, তাহাতে শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। ভাগবতাদির তাবত মর্ম্ম তাঁহার কণ্ঠস্থ। উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া, চৈতন্যকে শিষ্য করিতে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তিনি চৈতন্যের সহিত হরিগুণানুকীর্ত্তন করিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। পুরবীরের প্রতি চৈতন্যের অসাধারণ ভক্তি জন্মিল।

পুরবীর, মধ্যে মধ্যে চৈতন্যের নিকট আসিয়া নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। অচিরে উপদেশবীজ অঙ্কুরিত হইল—চৈতন্য হরি প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বত্র হরিময় হইল। লক্ষ্মীদেবীর পবিত্র প্রেম, হৃদয় হইতে অপনীত হইয়া, তাহা হরি-প্রেমে পূর্ণ হইল! মাতার বিমলস্নেহের পরিবর্ত্তে তিনি হরির সহস্রধারনিঃসৃত স্নেহামৃত পান করিতে লাগিলেন। সংসার তাঁহার নিকট অতীব তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হইল। চৈতন্যের আর সংসারে দৃষ্টি নাই, আহারনিদ্রার অবকাশ নাই, দিবারজনী কেবল 'হরি হরি' করিয়াই কাটাইতে লাগিলেন। একে চৈতন্যের হৃদয়ক্ষেত্র আশাতীত উর্ব্বর, তাহাতে উপযুক্ত কৃষক পুরবীর ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়া যথাযোগ্য জল সেচন করিতে লাগিলেন। অচিরে—সুফল ফলিল। একদিন গভীর রজনীতে মাতার স্নেহ-সূত্র ছিন্ন করিয়া, পত্নির পবিত্র—প্রেম উপেক্ষা করিয়া, পরিবার বর্গকে অকুল পাথারে ভাসাইয়া, চৈতন্য গৃহ-ত্যাগী হইলেন। যখন রাত্রি গভীরা হইয়াছে, নগরের জন-কোলাহল যখন নিঃশব্দে ডুবিয়া গিয়াছে, জন-প্রাণীর যখন সাড়া শব্দ নাই, চৈতন্য সেই সময় সেই গভীর নিশিতে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। পত্নির পবিত্র ভুজপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারজ্ঞানশূন্যা বালিকা—যে কেবল তাঁহাকেই চিনিত তাঁহাকেই জানিত—সেই লক্ষ্মীদেবীকে অকুল দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, গভীর রজনীতে গৃহ ত্যাগ করিলেন। হরিপ্রেমে যাঁহার হৃদয় মুগ্ধ, তুচ্ছ সংসার কি তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে?

প্রভাতে শচীদেবী গাত্রোত্থান করিয়া মাথায় হাত দিলেন।

লক্ষ্মীদেবী ধরাসনে পড়িলেন, পরিবারবর্গ উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল। শচীদেবী একমাত্র চৈতন্যকে লইয়া তাঁহার দশটী সন্তানের শোক অনেকাংশে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এখন একাদশটী পুত্রের শোক একত্রে তাঁহার হৃদয়ে উঠিয়া তাঁহাকে শয্যাশায়িনী করিল। তিনি অনাহারে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। লক্ষ্মীদেবী—স্বামী শোকে অধীরা, তথাপি শ্বশ্রূর সেবায় তৎপরা। শচীদেবীর আর বাক্‌শক্তি নাই, কেবল দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে "নিমাইরে! কি করিলিরে" এই মাত্র রব সকৃৎ অর্দ্ধোচ্চারণ করিতেছেন। পরিবারবর্গ অকুল বিষাদসাগরে পড়িয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

২

কাটোয়া নগরীতে ভাগিরথী তটে, চৈতন্য, পুরবীরের নিকট পবিত্র হরিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া হরিনাম প্রচারার্থ নগরে নগরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তৎকালের প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ নিত্যানন্দ ঠাকুর, গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য, মুরারী গুপ্ত ও মুকুন্দ গুপ্ত প্রভৃতি দেশ বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সময় হিন্দুধর্ম্মজগতে বিশিষ্ট অবনতি সংঘটিত হয়। বেদবিহিতক্রিয়াকলাপশূন্য হইয়া, সকলে মদ্যমাংসে, তান্ত্রিক উপাসনায় বিব্রত। দুষ্ক্রিয়াস্রোতে দেশ টলটলায়মান। এই সময়ে———এই বিষম দুর্দ্দিনে, চৈতন্য, হরিনামপ্রচারে নির্গত হন। তিনি এই অসংখ্য তান্ত্রিকগণের বিপক্ষে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া তর্ক দ্বারা সকলকে পরাজিত করিয়া,

হরিমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। সকলে পবিত্র হরিনামে বিমোহিত হইয়া, দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। অধিক কি, আকবর বাদসাহের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়-রূপ-সনাতন পর্য্যন্ত হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইল। মুসলমানধর্ম্মজ্ঞ রূপসনাতন হরিনামে বিহ্বল হইয়া চৈতন্যের পাদমূলে স্ববশ গ্রহণ করিল!!

চৈতন্য, কাটোয়া হইতে গয়া, গয়া হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, তথা হইতে হরিদ্বার এইরূপ নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি যৎকালে পুরীতে আগমন করেন, তখন ন্যূনাধিক এক সহস্র শিষ্য তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। চৈতন্য, পুরীতে সমাগত হইয়া দেবদর্শনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার হৃদয় পুলকিত হইল, পুলকপূর্ণহৃদয়ে রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে তিনি বলিলেন,—

প্রিয়ঃ সোয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র
মিলিতস্তথা হংসারাধা।
তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম সুখং॥
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর মুরলী পঞ্চম জুষে।
মনোমে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি॥

পুরীর প্রধান পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রীর সহিত এই সময় তাঁহার পরিচয় হয়। শাস্ত্রী উপযুক্ত শ্রোতা পাইলেন—মণি-কাঞ্চনে সংযোগ হইল। শাস্ত্রী প্রত্যহ বেদান্ত পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন—চৈতন্য তাহা নীরবে শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। এক দিবস শাস্ত্রী কহিলেন "আপনি ত

কেবল শুনিয়াই যাইতেছেন, উত্তর করেন না কেন?" চৈতন্য কহিলেন "আপনি শুনিতেই ত বলিয়াছেন, উত্তর করিতে ত বলেন নাই? আমি আপনার সপ্তাহের পাঠ ও ব্যাখ্যা অভ্যাস করিয়াছি।" এই বলিয়া চৈতন্য সপ্তাহ-ব্যাপী পাঠ ও ব্যাখ্যা অনর্গল বলিয়া গেলেন। শাস্ত্রী আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিলেন "আপনি যথার্থই ধরা-ভারহরণার্থ অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।" শাস্ত্রী ভক্তিভাবে চৈতন্যকে প্রণিপাত করিলেন। সেই হইতে শাস্ত্রী চৈতন্যের শিষ্য-শ্রেণির মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

৩

গভীরনিশীথে কাশীর নিকটস্থ পল্লিবিশেষের শ্মশান-ক্ষেত্রে মহা তুমুল ব্যাপার উপস্থিত!—অমাবশ্যা, টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদ্বিকাশ হইয়া অন্ধকারের ভীষণ বৃদ্ধি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ঝঞ্ঝা বায়ু, শ্মশানস্থ মৃৎ-কলস বংশ-দণ্ডাদি আন্দোলিত করিয়া এক প্রকার ভীষণ শব্দ সমুৎপাদন করিতেছে। বামাচারিগণ মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া, শবাসনে আসীন হইয়া শবসাধনায় নিযুক্ত। বামাচার-সম্মত-উপকরণ শ্মশানের ইতস্ততঃ সজ্জিত। শবের বিকটগন্ধ উপেক্ষা করিয়া বামাচারিগণ তন্ত্রোক্ত শব-সাধনায় নিযুক্ত। শ্মশান,—নীরব নিথর।

অদূরে খোল করতালের ধ্বনির সহিত "হরিনাম" বামাচারিগণের কর্ণপথে প্রবিষ্ট হইল। শব সাধনায় বিঘ্ন ঘটিল, মদ্যপানজনিত মত্ততায়—ক্রোধের উদয় হইল। বামাচারিগণ

ভীষণমূর্ত্তি ধরিয়া প্রশানন্ত বংশদণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া অত্যাচারী-যোগবিঘ্নকারী—বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য, রুদ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকটস্থ হইয়া আরক্ত নয়নে বিকট অঙ্গভঙ্গি সহকারে কহিল "কে তোরা" অনর্থক আমাদিগের ইষ্ট কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করিলি? ভিক্ষা যাহাদিগের বলাবল, ভিক্ষার জন্য যাহাদের সংকীর্ত্তন, তাহাদিগের ইষ্টলাভের সম্ভাবনা কোথায়? মূর্খ তোদের আশা কি পূর্ণ হইবে? এ রাত্রিতে কে তোদের ভিক্ষা দান করিবে? বৈষ্ণব সম্প্রদায় উত্তর করিল না, সকলেই চৈতন্য দেবকে বলিল —গুরুদেব যথোপযুক্ত উত্তরদান করুন। চৈতন্য অগ্রসর হইয়া সস্নেহে কহিলেন "কেন ভাই! এত ক্রুদ্ধ হইয়াছ? তোমাদের ইষ্টের ব্যাঘাত জন্মান ত আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়। আমরা ভিক্ষুক বটে, কিন্তু আমাদের ভিক্ষা লব্ধধন—নিজের জন্য নয়—বিলাইবার জন্য,—ভাই সে মহাভিক্ষার প্রার্থনার ত কালাকাল নাই। সে ভিক্ষা যে দিবারজনীই আমাদিগের প্রার্থনীয়।" বামাচারি কহিল "পাগল! অভাব হইলেই কালাকালজ্ঞান বিলুপ্ত হয় সত্য, কিন্তু যাহারা প্রার্থনা করিবে, তাহাদিগের চৈতন্য না থাকিলে প্রার্থনা কারীগণের আশা কে পূর্ণ করিবে? দেখিতেছ না, পুরবাসিগণ এখন নিদ্রিত।" চৈতন্য কহিলেন "ভাই! চৈতন অচৈতন্যের নিকট ভিক্ষা করেন না। যিনি চৈতন্য—আহার নিদ্রা প্রভৃতি সাংসারিক ভাবের যিনি অতীত, সেই চৈতন্যের নিকটই আমরা ভিক্ষা করিতেছি। এ ভিক্ষা অচৈতন্যের পূর্ণদান করিবার ত সামর্থ নাই, ভাই! আমাদিগের প্রাণের আশা কি নর-জগত বাসীর পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে!" বামাচারিগণ কর

তালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল "এতক্ষণে বুঝিলাম তোমরা বাতুল! বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান! এতগুলি বাতুলের এক-স্থানে সম্মীলন করিয়া নিজের অপূর্ব্ব লীলার পরিচয় দিলেন।" চৈতন্য একটু অগ্রসর হইয়া অধিকতর স্নেহব্যঞ্জকস্বরে কহি-লেন "ভাই! একটু অভিনিবেশ সহকারে ভাবিয়া দেখ, এখনি বাতুলতার ভূরি ভূরি প্রমান পাইবে—শ্রীহরি—বামাচারিগণ কর্ণে অঙ্গুলি দিল। দারুণ পরুষকণ্ঠে ঘৃণাব্যঞ্জক-স্বরে, কহিল "হতভাগা! অধঃপাতে গিয়াছ? জ্ঞান ছিল বুঝি তুই জ্ঞানী। এখন দেখিতেছি, পাষণ্ডের অগ্রণী! ধিক্ শত ধিক্! কপট লম্পট হরির নাম উচ্চারণ? দূর পাপাত্মা, আমরা শক্তি সাধ-নায় নিযুক্ত ছিলাম, কেন আমাদিগের সে কার্য্যে বিঘ্ন ঘটা-ইলি?" চৈতন্য কহিলেন "ক্রুদ্ধ হইও না। তুমিও যাঁহার উপাসনা করিতেছ, আমরাও তাঁহারই উপাসক। ভাই! জান না "কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ" যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী! ভাই! তুচ্ছ হিংসাবৃত্তি পরিহার করিয়া চিন্তা করিলেই দেখিবে, কৃষ্ণ-কালী অভেদ।" তখন চৈতন্য বুঝাইয়া দিলেন, যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী——কৃষ্ণের বহিঃ প্রকৃতি মন্ত্র।

বামাচারীগণ যোগাচার পরিত্যাগ করিয়া প্রেমাচারে বিনিযুক্ত হইল। তন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া হরি মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। চৈতন্যের সহযাত্রী হইয়া হরিনাম গাহিয়া জীবনের সারধন হরিসাধনে জীবন কাটাইতে লাগিল। বামাচারীগণ সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া বলিত "এমন শান্তি, তাহারা আর কখনও প্রাপ্ত হয় নাই।—হরি নাম শান্তির আধার!!!

৪

দিবা-দ্বিপ্রহর, মার্ত্তণ্ডদেব মধ্য-গগণে আরূঢ় হইয়া জগত সন্তাপিত করিতেছেন, প্রখর—কিরণজালে জগত প্রতপ্ত! এই অসময়ে, ভক্তগণ প্রখর-সূর্য্যকর উপেক্ষা করিয়া সংকীর্ত্তনে বাহির হইয়াছেন। খরতাল, খোল, তুরি, ভেরী প্রভৃতির একত্র যোগলব্ধ স্বরলহরী নবদ্বীপধাম পূর্ণ করিয়া হরিনামসহ সু-দূর আকাশে গিয়া মিলাইতেছে!! চৈতন্য, শ্রীনাথ, অদ্বৈত শ্রীনিবাস, গোবিন্দ, মুকুন্দ, গোপাল ও আনন্দ প্রভৃতি হরিনাম-পিপাসু ভক্তগণ হরিনামে উন্মত্ত হইয়া, অসময়ে সংকীর্ত্তনে নির্গত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের এই অসাময়িক সংকীর্ত্তনে, কেহ বিরক্ত কেহ বা পুলকিত হইয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দান করিতেছে। ভক্তগণের চিত্ত, অনন্যলক্ষ্য হইয়া একমাত্র হরিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত, সুতরাং বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত!!

জগাই-মাধাই ভ্রাতৃদ্বয় মূর্খ, জ্ঞানশূন্য, নীচবংশজ, এবং মদ্যপ। তাহাদিগের সমস্ত দিনের উপার্জ্জন একমাত্র মদ্যেই পর্য্যবসিত হয়। ভ্রাতৃদ্বয়—দিবারজনী সুরাদেবীর সেবা ও নানাবিধ অবৈধাচরণে নিযুক্ত থাকে। জগাইমাধাই—অত্যাধিক সুরা সেবনে উন্মত্ত, জ্ঞানশূন্য—নিঃশব্দে বৃক্ষতলে পতিত। এমতকালে তাহাদিগের কর্ণপথে বিবিধ বাদিত্র সহযোগে "হরিনাম" প্রবিষ্ট হইল। জগাই মাধাইয়ের হৃদয়ে হরিনাম যেন প্রতপ্ত শলাকাবৎ বিদ্ধ হইল। ক্রোধের সীমা রহিল না, মদ্যপানজনিত অবসাদ বিদূরিত করিবার জন্য, তাহারা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহা হইয়া উঠিল না। সুললিত হরিনামধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া

তাহাদিগের অবসাদ দ্বিগুণ-বর্দ্ধিত করিল. তখন ভ্রাতৃদ্বয় আরক্ত-লোচনে বংশদণ্ড গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবগণকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইল!

জগাই-মাধাইকে সকলেই চিনিত; তাহাদিগের দুশ্চরিত্রতা কাহারও অবিদিত ছিলনা, এক্ষণে ক্রুদ্ধ ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই ভীষণমূর্ত্তি দর্শনে সকলেই ভীত হইল। চৈতন্য, সম্প্রদায়ের অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, পশ্চাদ্বর্ত্তি সকলেই চৈতন্যের আসন্ন-বিপদ দর্শনে ভীত হইয়া একবাক্যে কহিল "পলায়ন কর! পলায়ন কর!" চৈতন্য সে বাক্যে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না; এক মনে হরিগুণগানে মনোনিবেশ করিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য চৈতন্য পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন। মদোন্মত্ত জগাইমাধাই বিভৎস্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সবেগে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে লাগিল! বসন বিস্রস্ত, পদে পদে পতিত হইয়াও দুর্দ্দান্ত যম-কিঙ্করের ন্যায়, ভ্রাতৃদ্বয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সম্মুখীন হইল। চৈতন্য অগ্রগামী, জগাই তাহারই মস্তক লক্ষ্য করিয়া প্রচণ্ড দণ্ডাঘাত করিল!

একি? একি? কি করিলি রে! নরাধম! কি সর্ব্বনাশ সাধিলি রে। পাপাধম! রক্তস্রোতে ধরণী সিক্ত করিল, গোরাঙ্গের গৌরাঙ্গ শোণিতসিঞ্চনে কি এক অপূর্ব্বভাব ধারণ করিল। ভক্তগণ "মার মার" শব্দে জগাই মাধাইয়ের দিকে অগ্রসর হইল। চৈতন্যহন্তা পাপাধম ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্ষুদ্র প্রাণ, শমন করে সমর্পণ করিবার জন্য, শত শত হস্ত উত্থিত হইল। দয়াল চৈতন্য, যন্ত্রণায় অচৈতন্য হইয়াও অঙ্গুলি সঙ্কেতে প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন। আততায়ী প্রাণহন্তা জগাই-মধাই অভয় প্রাপ্ত

হইল। মদোন্মত্ত জগাই-মাধাইয়ের হৃদয় পর্য্যুদস্ত জ্ঞানশূন্য, তথাপি এ দৃশ্যে তাহাদিগের হৃদয় যেন একটু—শঙ্কাকুলিত হইল, যেন—হৃদয় মধ্যে একটা অব্যক্ত অনমুভবনীয় অনুভাবের তরঙ্গ উঠিল!! জগাই ভাবিল হৃদয়ের এ ভাব অসহ্য, যদি ঐ উত্থিত শত শত হস্তের প্রবল তাড়ন তাহার শরীর স্পর্শ করিত সে যন্ত্রণাও ইহা অপেক্ষা লঘু।" মাধাই ভাবিল "যে, প্রহার সহ্য করিয়াও তৎপ্রতি কৃপা প্রদর্শন করে, তাহার নেশা, আমাদিগের নেশা হইতেও গাঢ়?"

চৈতন্য শিষ্যগণের পরিচর্য্যায় অচিরে সুস্থ হইলেন। চারি-দিকে চাহিয়া দেখিলেন—জগাই-মাধাই নিঃশব্দে সশঙ্কভাবে, একপার্শ্বে দণ্ডায়মান!! শত শত চক্ষুর্জ্যোতিতে দগ্ধ হইয়া মৌনাবলম্বনে একান্তে ভ্রাতৃদ্বয় দণ্ডায়মান!! দয়ার সাগর যিনি, প্রাণিগণের উদ্ধারই ব্রত যাঁহার, তিনি কি এ দৃশ্য দর্শনে স্থির থাকিতে পারেন? জগাই-মাধাইয়ের হৃদয়ের সেই ভীষণ বিপর্য্যয়—অবস্থা উপলব্ধি করিয়া আর কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? চৈতন্য সস্নেহে কহিলেন "আয় ভাই! নিকটে আয়—।" জগাইয়ের প্রবল প্রহারে তাঁহার আর উঠিবার সামর্থ নাই, কিন্তু সে কথা উল্লেখ করিলে যদি তাহার মনে কষ্ট হয়, যদি প্রজ্জ্বলিত অনুতাপানলে তাহার ক্ষীণ হৃদয়কে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, এই ভয়ে সে কথার কোন উল্লেখও করি-লেন না। স্নেহভরে কহিলেন "জগাই মাধাই! এত ক্ষুণ্ণভাব কেন ভাই? না জানিয়া, না বুঝিয়া তুচ্ছ নেশার বশীভূত হইয়া, যে কর্ম্ম করিয়াছ তাহার জন্য অনুতাপ কেন? আজি তোদের এমনি নেশার বশীভূত করিব, যে, সে নেশা আর,

এ জন্মে কি জন্মজন্মান্তরেও অবসান হইবে না ! সে নেশায় অনুতাপ নাই--অশান্তি নাই, বিপত্তি নাই। এ নেশায় মত্ততা, সে নেশায় শান্তি ; সে নেশায় অনন্ত জ্ঞান, এ নেশায় ভ্রান্তি ; এ নেশায় অধোগতি ; সে নেশায় উন্নতি, এ নেশায় দেহক্ষয়, সে নেশায় মৃত্যুঞ্জয় হয়। তাইবলি জগাই--মাধাই ! আজ তুচ্ছ পার্থিবনেশায় মুগ্ধ না হইয়া ; ভক্তি-নেশার অনুসরণ কর, বল রে জগাই বল রে মাধাই, সুধাহরিনাম ! জগাই-মাধাইয়ের মত্ততা বিদূরিত হইয়াছে !!! অকপটে গাইল হরিনাম। চৈতন্য, প্রহারযন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া, জগাই মাধাইয়ের সহিত হরিনামে যোগ দিলেন, সে সুধাকণ্ঠ নিঃসৃত হরিনাম শ্রবণে জগাই-মাধাইয়ের চৈতন্য হইল, চৈতন্যের পদ ধারণ করিয়া কহিল "দয়াময় তুমি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি প্রভু।" চৈতন্য কহিলেন--"হরিনাম" সর্ব্বপাপ বিনাশকারী শ্রীহরির পবিত্রনাম উচ্চারণ কর,---নাম-সুধা পান কর, সকল পাপ নষ্ট হইবে--মনের অন্ধকার দূর হইবে।" তখন, চৈতন্য পাতকীদ্বয়কে পবিত্র হরিমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সহচরগণকে কহিলেন "গাও হরি নাম, আজি আমাদিগের পরম সৌভাগ্য।" সহচরগণ চৈতন্যের অলৌকিক কার্য্য দর্শনে যুগপৎ মোহিত ও বিস্মিত হইল। সজলনয়নে করযোড়ে ভক্তিভরে চৈতন্য-চরণে প্রণিপাত করিল। তখন পুনরায়—সকলে সানন্দে হরি নাম গাইতে গাইতে, নগর ভ্রমণে নির্গত হইলেন। পাতকী জগাই-মাধাই পরমানন্দে আনন্দময় নিত্যানন্দের নাম গাইয়া সকল পাপের শান্তি করিল। পাপী ধার্ম্মিক হইল, চৈতন্যের ব্রত---এইরূপে সমধা হইতে লাগিল।

চৈতন্য সমগ্র তীর্থমণ্ডলপর্য্যটন করিয়া মাতৃচরণ-দর্শন-বাসনায়, পুনরায় নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। পুত্রবিয়োগ-বিধুরা শচীদেবী হারাধন হৃদয়ধন প্রাণাধিকধন চৈতন্যের মুখদর্শন করিয়া সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইলেন। সাধ্বী বিষ্ণুপ্রিয়া, যাঁহার পবিত্রমূর্ত্তি হৃদয়চিত্রে চিরচিত্রিত করিয়া, যাঁহার আরাধ্য চরণ আরাধনা করিয়া, এতদিন জীবনধারণ করিয়াছিলেন, সেই স্বামী সন্দর্শন করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইলেন। স্বামীচরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া সকল আশা পূর্ণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে চৈতন্যের অমানুষী কীর্ত্তিকলাপ বঙ্গের সর্ব্বত্র ঘোষিত দেখিয়া ও তাঁহার অলৌকিক কার্য্যপরম্পরা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপবাসীগণ বিমোহিত হইয়াছিল, এক্ষণে সানন্দে শ্রবণ করিল,—চৈতন্য গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তখন নগরবাসীগণ পুলকিত হইয়া, দলে দলে চৈতন্যের নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। চৈতন্যের যুক্তিপূর্ণ উপদেশে বিমোহিত হইয়া, দলে দলে সকলে পবিত্র হরিনামে দীক্ষিত হইতে লাগিল। দিবারজনী খোলখরতালের মধুর শব্দের সহিত সুমধুর হরিনাম নগরের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নগরবাসী আবালবৃদ্ধবণিতা, শয়নে স্বপ্নে, হরিগুণ গাঁথা, হরিগুণ কথা লইয়া কালাতিবাহন করিতে লাগিল। নবদ্বীপ হরিনামে পূর্ণ হইয়া নবভাব ধারণ করিল। এত-দিন পরে তুচ্ছ ক্ষুদ্রপল্লী, অগণ্যজন-সমাকুল নবদ্বীপ নামে অভিহিত হইল! দেশবিদেশাগত বৈষ্ণবসম্প্রদায় নবদ্বীপে পবিত্র গঙ্গাতীরে বসতি করিতে লাগিল। নগরের সর্ব্বত্র, হরি হরি, নবদ্বীপ——হরিময়!

একদা, চৈতন্য মাতৃপদতলে উপবেশন করিয়া হরিগুণ বর্ণন করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে হরি-সম্বন্ধে তিনি কহিয়াছিলেন ;—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা সুধাপগা,
ন সাধবো ভাগবতা কথা শ্রয়াঃ
ন যত্র যজ্ঞেশ কথা মহোৎসবা সুরেশ,
লোকোপি সবৈন সেব্যতাঃ ॥
সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুঃ ত্রেতায়াং যজতে মুখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচার্য্যয়াং কলৌতদ্বরি কীর্ত্তনাৎ ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরির্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা ॥

শ্রীহরির প্রতি এতাদৃশী ভক্তি, এতাদৃশ আত্ম-দান ও একাগ্রতা না থাকিলে, চৈতন্য কি জগাইমাধাইরে হরিনাম বিলাইতে পারিতেন? এতদূর ত্যাগস্বীকার না করিলে মায়ামোহপাশ হইতে এতদূরে না থাকিলে, তিনি কি হরি নামে জীবের মানসান্ধকার নষ্ট করিতে পারিতেন? এতদূর আত্মত্যাগ না করিলে, জগতের হিতসাধনে কদাচ সমর্থ হওয়া যায় না। চৈতন্য—সেই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ!—তাঁহার মুক্তি ভক্তি ও শান্তি হরিগত!!——নতুবা এতটা ঐশ্বরিক শক্তি তিনি

কি জন্য পাইবেন ? এতদূর ভক্তি না থাকিলে তিনি কি যোগী-শ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকারে সমর্থ হইতেন ?

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, চৈতন্য, পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বরের অংশ—অবতার কিরূপে ?—প্রথমতঃ ইহাই দ্রষ্টব্য যে, কোন্ যুক্তিবলে চৈতন্যকে পূর্ণব্রহ্ম বলা যায় !

"কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহং মহীতলে।
ভাগীরথীতটে রম্যেভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥"

পদ্ম পুরাণ

"অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকানিক্ষামি সর্ব্বথা॥"

নারদীয় পুরাণ।

"কলিনা দহ্যমানানাং পরিত্রায় তনুভৃতাং।
জন্ম প্রথমে সন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু॥"

গরুড় পুরাণ।

"অহং পূর্ণ ভবিষ্যামি যুগ সন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপরে নবদ্বীপে বারমেকং শচীসুতঃ॥"

যামল।

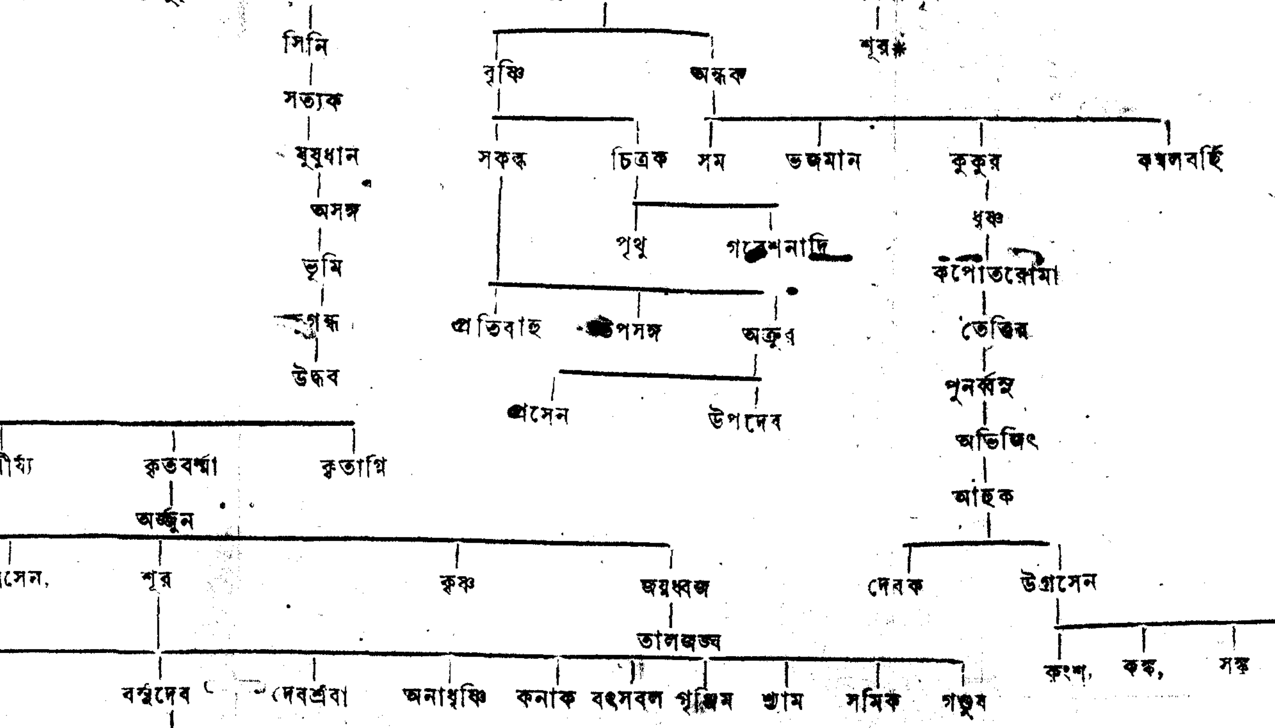
চৈতন্যের পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনের পক্ষে এই সমস্ত শ্লোকই প্রধান অবলম্বন ; কিন্তু, আমরা বলি, এই সমস্ত শ্লোক তৎতৎ-গ্রন্থের প্রক্ষিপ্ত অংশ। চৈতন্যের ভক্তগণ কর্তৃক এই সমস্ত শ্লোক উক্ত পুরাণাবলীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যে সমস্ত পুরাণ অতি প্রাচীন কাল হইতে হস্তলিখিত কীটদষ্ট-পুথির

আকারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে উক্ত শ্লোক গুলির নাম গন্ধও নাই। সুতরাং এ সকল শ্লোকের প্রতি কি করিয়া নির্ভর করা যাইতে পারে? তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, যে যে কারণে, বুদ্ধ, অবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন চৈতন্যেও সেই সমস্ত গুণ ছিল, এবং সেই হেতুবাদে চৈতন্যও অবতার মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। কিন্তু বুদ্ধের অবতারত্ব সম্বন্ধেও আমাদিগের প্রবল সন্দেহ আছে, সুতরাং, চৈতন্যের অবতারত্ব স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। তবে তিনি যে একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন তিনি যে একজন ধর্ম্ম-সংস্কারক ইহা আমরা সহস্র বার স্বীকার করি। এবং সেই কারণে আমরা তাঁহার চরণে প্রণত হইতেও কুণ্ঠিত নহি।

চৈতন্য, যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা এক্ষণে ঘৃণিত নেড়া নেড়ীর প্রধান অবলম্বন হইয়া দাড়াইয়াছে। সংসারে যত কিছু পাপ কার্য্য আছে তাহাই চৈতন্যপ্রদর্শিত বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম তুল্য ধর্ম্ম জগতে আর নাই। ইহা আমরা একবাক্যে স্বীকার করি। এমন মহান ধর্ম্ম—এমন বিশ্বজনিন ধর্ম্ম জগতে আর কোথায়ও দেখিতে পাই না। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া জীব, নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাণমুক্তিলাভে সমর্থ হইতে পারেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

চৈতন্য পূর্ণ ব্রহ্ম নহেন ভগবদ্ভক্ত মাত্র।

"চৈতন্য ভগবদ্ভক্ত নচ পূর্ণ নচাংশ।"



সিনি
সত্যক
যুযুধান
অসঙ্গ
ভূমি
যুগন্ধ
উদ্ধব
বৃষ্ণি
অন্ধক
শূর*
সফল্ক
চিত্রক
সম
ভজমান
কুকুর
কম্বলবর্হি
পৃথু
গবেশনাদি
ধৃষ্ণ
কপোতরোমা
তৈত্তির
পুনর্ব্বসু
অভিজিৎ
আহুক
প্রতিবাহু
উপসঙ্গ
অক্রূর
প্রসেন
উপদেব
বীর্য্য
কৃতবর্ম্মা
কৃতাগ্নি
অর্জ্জুন
সেন,
শূর
কৃষ্ণ
জয়ধ্বজ
দেবক
উগ্রসেন
তালজঙ্ঘ
বসুদেব
দেবশ্রবা
অনাধৃষ্ণি
কনাক
বৎসবল
সৃঞ্জয়
শ্যাম
সমিক
গণ্ডুষ
কংস,
কঙ্ক,
সঙ্ক

দশম ভাগ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মহাভারতের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই শ্রেষ্ঠ অংশ। ইহা সকলেরই পাঠকরা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় ছবি সাধনের স্থান প্রচুর নহে, সুতরাং গীতার তাবদংশ উদ্ধৃত করা কোন ক্রমেই সম্ভবে না। তবে গীতার মধ্যে আবার যে যে অংশ উৎকৃষ্ট, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা—এই সামান্য অংশ পাঠ করিয়া পাঠকগণ গীতার সারবত্তা উপলব্ধি এবং অন্য সুযোগে তাহার সমগ্র পাঠ করবেন। প্রথম অধ্যায়ে তাদৃশ কোন অসামান্য ঘটনা নাই, কেবল গীতার সূচনা মাত্র, সুতরাং তাহা পরিত্যক্ত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১

পণ্ডিতেরা গতাসু অথবা অগতাসু (জীবিত) জনের জন্য শোক করেন না। তুমি প্রজ্ঞাবাদী হইয়া, কেন (অশোচ্যে) শোক করিতেছ।

নত্বেবাহং জাতুনাসং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
নচৈব ন ভবিষ্যাম সর্ব্বেবয়মতঃপরং॥ ১২

আমি, তুমি এবং এই সমস্ত নৃপতিগণ, (যাহাদিগকে তুমি বধ করিতে অসম্মত হইতেছ) পূর্ব্বে আমরা কেহই

ছিলাম না ; (১) এবং পরে যে হইব, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ? (২)

দেহিনোস্মিন যদাদেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তীর্দ্ধীরস্তত্র নমুহ্যতি ॥ ১৩

দেহিগণের দেহে কৌমার, যৌবন, এবং জরা যদ্রূপ (বিনা চেষ্টায় পরিবর্ত্তিত হয়) তদ্রূপ মৃত্যু হইলেই দেহান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ধীর ব্যক্তি তজ্জন্য মোহ প্রাপ্ত হন না।

যংহি ন ব্যথয়ন্তেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

ইহাতে (শীত, উষ্ণ সুখ দুঃখ) যে পুরুষকে ব্যথা দিতে না পারে, হে পুরুষর্ষভ! তিনিই অমৃতত্ব লাভে অধিকারী।

অবিনাশিত্ত তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।
বিনাশ মব্যয়সাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭

---

(১) 'ছিলাম না" অর্থে দেহের কিছুই ছিলনা, এরূপ বুঝিতে হইবে না। সংসারবাসী জীবের শরীর, যে যে উপাদানে গঠিত, তাহা অবিনশ্বর, তাহার ধ্বংস নাই। সেই পঞ্চভূত পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল, কেবল বর্ত্তমান রক্তমাংসগঠিত শরীরই পূর্ব্বে ছিল না, এবং পরেও থাকিবে না, ইহাই বুঝিতে হইবে।

(২) "নিশ্চয়তা কোথায়"—ইহাতে এরূপ মনে করা যুক্তি সঙ্গত নহে, যে, দেহ ধ্বংশ হইলে পুনরায় তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, তবে সকলেই যে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হইবে, ইহার ত নিশ্চয়তা নাই। দেহ ধ্বংসের পর কৃতকর্ম্মের ফলানুসারে আত্মা পুনর্জন্ম, নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট যোনী স্বর্গ বা নরক প্রাপ্ত হয়, এস্থলে ইহাই সূচিত হইয়াছে।

হি। এই (জগত ব্যাপী) আত্মা অবিনশ্বর ও অব্যয় বলিয়া জানেন। তাঁহাকে কেহই বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

অন্তবন্তইমে দেহা নিত্যস্যোক্তা শরীরীণঃ!
অনাশিনো প্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুদ্ধস্য ভাবত ॥ ১৮

আত্মা নিত্য এবং অবিনশ্বর হইলেও, দেহ ধ্বংশশীল এবং প্রমেয়। হে ভারত! (এই জানিয়া) যুদ্ধে নিযুক্ত হও।

ন জায়ন্তেম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজোনিত্যশাশ্বতোহয়ং পুরাণো
নহন্য মানে শরীরে ॥ ২০

আত্মা জন্মমৃত্যুহীন, (৩) জন্ম হইলেও স্থিতি, হ্রাস বৃদ্ধি ও বিকারশূন্য। শরীরনাশ হইলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।

বাসাংসি জীর্ণা যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহি ॥ ২২

যদ্রূপ জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া, মানবগণ নূতন বস্ত্র

(৩) আত্মার দ্বিবিধ গতি, যখন আত্মা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, তখন তিনি জন্ম মৃত্যু—সুখদুঃখ—বিহিত, আর যখন তিনি প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, প্রকৃতিতে সংযুক্ত, তখন তিনি জন্ম-মৃত্যুহীন থাকিলেও তাঁহার আশ্রয়স্থল শরীর জন্মমৃত্যুর অধীন। "আত্মার জন্ম হইলেও স্থিতিহীন"—মর্দ-জগতে আত্মার স্থিতি কতক্ষণ?

গ্রহণ করেন; তদ্রূপ (আত্মা) জীর্ণশরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহে গমন করিয়া থাকেন।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকং।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩

(আত্মা) অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তিত, পাবক দ্বারা দগ্ধ, জলদ্বারা ক্লিন্ন, অথবা বায়ুর দ্বারা শুষ্ক হন না।

তবে আত্মা কিরূপ?—

অচ্ছেদ্যোয়মদাহ্যোয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ॥ ২৪

আত্মা—অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, এবং অশোষ্য। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থানু, অচল এবং সনাতন।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানু শোচিতুমর্হসি॥ ২৫

তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, এবং বিকার শূন্য। তাঁহাকে বিদিত হইয়া, অনুশোচনা পরিত্যাগ কর।

হে অর্জ্জুন! যদি তুমি বল,—

অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং।
আত্মা নিত্যই জন্মগ্রহণ করিতেছেন ও নিত্যই মৃত হইতেছেন
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬

হে মহাবাহো! তথাপি তুমি শোক করিতে পার না।

কেন?—

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবজন্ম মৃত্যস্য চ।
তস্মাদ্ পরিহার্য্যার্থে নত্বং শোচিতুমর্হষি ॥ ২৭

যে জাত, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়, এবং যে মৃত তাহার জন্ম নিশ্চয়; এই জন্য তুমি শোক করিতে পার না।

অব্যক্তাদীনি ভূত্যানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

আত্মা প্রথমে অব্যক্ত ছিলেন, (৪) মধ্যে তিনি ব্যক্ত হন, (৫) আবার নিধন প্রাপ্ত হইলে, পুনবায় তিনি অব্যক্ত হইবেন, (৬) অতএব হে ভাবত। তজ্জন্য চিন্তা কি?

যোগসম্বন্ধে অর্জ্জুন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, কৃষ্ণ কর্ম্ম-যোগের মর্ম্ম কহিতেছেন।—

নেহাতি ক্রমণাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

কামনা বৰ্জিত যে কর্ম্ম, তাহার প্রত্যবায় হয় না, এবং স্বল্প প্রত্যবায়েও তাহার ফল নষ্ট হয না। অত্যল্প মাত্র অনুষ্ঠানে, এতদ্বারা (নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণে) মহাভয় (৭) হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

---

(৪) আত্মা যথন দেহ শূন্য, তথন তিনি পরমাত্মায় সংযুক্ত, পরমাত্মা অব্যক্ত, সুতরাং আত্মাও তথন অব্যক্ত।

(৫) আত্মা যথন শরীর যুক্ত, তথন তিনি ব্যক্ত।

(৬) আবার দেহান্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, তিনি যথন দেহ পরিশূন্য, তথন তিনি অব্যক্ত।

(৭) মহাভয়—কালভয়।

ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং ময়াপহৃত চেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪

যাহাদিগের চিত্ত ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত, সেই ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধির (মানবগণের) সমাধি হয় না।

নিষ্কাম যোগ কি?——

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥৪৮

হে ধনঞ্জয়! তুমি ঈশ্বরে তৎপর হইয়া এবং আসক্তি (কামনা) পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। কর্ম্মের সিদ্ধাসিদ্ধভাবে সমজ্ঞানকেই নিষ্কাম যোগ কহে।

দূরেণহ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি যোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯

হে ধনঞ্জয়! কামনা রহিত যে কর্ম্ম, তাহাই জ্ঞানের সাধন সকাম কর্ম্ম ইহাপেক্ষা অপকৃষ্ট। সকাম কর্ম্মানুষ্ঠাতাগণ (কর্ম্মজ) জ্ঞানের জন্যই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যণাময়ং॥ ৫১

বুদ্ধিযুক্ত (বুদ্ধি প্রণোদিত) কর্ম্মজ যে ফল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া মনীষিগণ জন্মবন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অনাময় (মোক্ষ) পদে গমন করেন।

স্থিতিপ্রাজ্ঞ কাহাকে বলে, কৃষ্ণ তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন;——

দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখে চ বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতিধীর্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬

যাঁহার মন দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেব স্পৃহা করে না. বাগ, ভয় এবং ক্রোধ শূন্য, তিনিই স্থিতিপ্রাজ্ঞ বলিয়া কথিত হন

তানি সর্ব্বাণি সংযম্যযুক্ত আসীতমৎপর।
বশে হি যাস্যান্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্টিতা ৬৪

যাঁহার সমস্ত (বৃত্তি) সংযমিত ও ভোগযুক্ত, (৭) ('কার্য্যক্ষম) ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত, তাঁহাব বুদ্ধি সর্ব্বদা নিশ্চল।

রাগদ্বেষ বিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরণ্।
আত্মবশ্যৈ বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৫

যাহার ইন্দ্রিয় সমূহ বাগদ্বেশবিমুক্ত এবং মনেব বশীভূত, সেই ব্যক্তিই শান্তিলাভে সমর্থ হয়।

নিশ্চল বুদ্ধিই মোক্ষলাভেব সেতু। চঞ্চল বুদ্ধিতে—বিষয়েই আসক্তি জন্মে। বিষয়াসক্তির ফল কি?———

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু প্রজায়তে।
সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে৬৬
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৭

যে ব্যক্তি বিষয় ধ্যানে নিমগ্ন, তাহারই বিষয়াসক্তি জন্মে। সেই বিষয়বাসনা হইতে কামনা, এবং কামনা হইতে ক্রোধের

---

(৮) ভোগযুক্ত—কার্য্যক্ষম। ভোগযুক্ত ইন্দ্রিয়, সংযম করাই মনুষ্যত্ব।

উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হইতে মোহ এবং মোহ হইতে স্মৃতিনাশ ঘটে। স্মৃতিনাশে বুদ্ধি নাশ এবং বুদ্ধিনাশ হেতু, সকলই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বুদ্ধিনাশে অশান্তির উৎপত্তি হয়। অতএব এস্থলে প্রতিপন্ন হইল যে, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করাই শান্তি লাভের একমাত্র উপায়। শান্তিলাভের উপায় কি তাহা কথিত হইতেছে।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৭১

যাঁহার চরিত্র কামনা, মমতা, অহঙ্কার ও স্পৃহা শূন্য, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।——

তৃতীয় অধ্যায়।

জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা নির্ণিত হইতেছে।

ন কর্ম্মণামনারম্ভ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
নচ সন্ন্যাসনা দেব সিদ্ধিং সমাধিগচ্ছতি॥ ৪

কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানশূন্য সন্ন্যাসে সমাধি লাভ হয় না। (কর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন কর জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।)

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগ মসক্তঃ স বিশিষ্যতি॥

হে অর্জ্জুন! যিনি অন্তরে ইন্দ্রিয় দমন করিয়া, বাহ্যে সেই

ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করেন, অথচ সেই (ঐন্দ্রিক কার্য্যের) কার্য্যের ফল কামনা না করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ

তস্মাদসক্তঃ সততঃ কার্য্য কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষ ॥ ১৯

সেই কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ফল—কামনা পরিহার করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা, পুরুষ পরমফল (নির্ব্বাণ) প্রাপ্ত হন।

চতুর্থ অধ্যায়।

মোক্ষ কি, তাহাই প্রসঙ্গত বিবৃত হইতেছে।

বীতরাগভয়ক্রোধামন্ময় মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবোজ্ঞান তপসা পুতামদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

ক্রোধ, ভয়, স্পৃহাশূন্য হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় করে, সে আমার প্রদত্ত পবিত্র তপস্যায় বহুজ্ঞান যুক্ত হইয়া আমাতেই লীন হয়। (লীন হওয়াই নির্ব্বাণমুক্তির লক্ষণ।)

বিধর্ম্মীগণের বিশ্বাস, হিন্দুধর্ম্মের উপাসনাপ্রণালী একদেশদর্শিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, সেই কথার সত্যাসত্য পাঠকগণ দেখুন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন,——

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১

যে, যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি সেই ভাবে

(তাহার অভিষ্ট) সম্পাদন করি। পার্থ! লোকসমূহ নানামত হইলেও কেবল আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকে।

সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান অপকৃষ্ট হইলেও লোকরক্ষার্থ বা পরোপকারার্থ তাহার অনুষ্ঠান প্রকৃষ্ট। এ সম্বন্ধে ভগবদুক্তি,——

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

গতসঙ্গ অর্থাৎ ক্রোধাদি নির্ম্মুক্ত। যে গতসঙ্গ, যাহার চিত্ত জ্ঞানেতে অবস্থিত, লোকরক্ষার্থ (সকাম) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাহা অকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগ্যং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪

লোকসমূহের সৃজন এবং কর্ত্তৃত্বে, ঈশ্বরের কোন কর্তৃত্ব নাই, কর্ম্মফল স্বভাব বশেই সংযুক্ত হয়। (৮)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিন॥ ১৮

---

(৮) জীব প্রথমে সম্পূর্ণ পাপ নির্ম্মুক্ত থাকে, পরে অবিদ্যা-প্রভাবে, জীব, পাপাসক্ত হয়।

ঈশ্বর নিষ্পাপ আত্মার স্রষ্টা, দেহ এবং দেহীর স্রষ্টা নহেন, তাহা স্বভাব দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভি, হস্তি ও কুকুরকে যিনি সমভাবে দর্শন করেন, তিনিই পণ্ডিত। (৯)

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ, তাহা কথিত হইতেছে।

বাহ্যস্পর্শে স্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি সংসুখং।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১

বাহ্য বিষয়ে যাঁহার মন আসক্তিশূন্য এবং অন্তরে যিনি পরমসুখ উপভোগ করেন, তিনি ব্রহ্মে সংযুক্ত (তন্ময়) হইয়া অক্ষয়সুখ প্রাপ্ত হন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমেব সাদয়েৎ।
আত্মৈ বহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫

আত্মার উদ্ধার আত্মারই কার্য্য। (আত্মা স্বীয় মুক্তির সংস্থান স্বীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই করিবেন।) যে আত্মা—ইহা পারে: সেই বন্ধু, অন্যথা—শত্রু।

অপিচ,———

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যে নৈবাত্মাত্মনাজিতঃ।
অনাত্মনস্তু সক্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব সক্রুবৎ॥ ৬

---

(৯) আত্মবৎ সর্ব্ব ভূতেষু য পশ্যতি স পণ্ডিত॥

চানক্য।

সমভাব—অর্থে চৈতন্যাচৈতন্যে একভাব। ব্রাহ্মণ—মনুষ্য জাতির শ্রেষ্ঠ; ব্যাঘ্র—হিংস্র জন্তুর শ্রেষ্ঠ; গাভি—গৃহপালিত পশুর শ্রেষ্ঠ; কুকুর—গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জগতের জীবশ্রেণি এই

যিনি আত্মাকে পরাজিত করিতে পারেন, তাঁহার আত্মাই বন্ধু। যিনি আত্মজয়ে অসমর্থ, তাঁহার আত্মা শত্রু। (১০)

যদা বিনিযতং চিত্ত মাত্মন্যে বা বতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো*যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮

যাঁহার চিত্ত আত্মাতে নিযুক্ত হইয়া অবস্থিত (সংযুক্ত) তিনি সর্ব্বকার্য্যে নিস্পৃহ।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্ব ভুতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

যিনি আপনাকে সর্ব্বভূতগত ও আত্মগত সর্ব্বভূতকে দেখিতে পান, সেই যোগযুক্তাত্মা (ব্যক্তিই) সর্ব্বত্র সমদর্শী।

সমদর্শী সম্বন্ধে কৃষ্ণ পুনরায় কহিতেছেন,—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়িপশ্যতি।
তস্যাহংন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

চারিভাগে বিভক্ত করাতে এবং সেই শ্রেনী চতুষ্টয়ের শ্রেষ্ঠের নামকরণ করাতে সমগ্র জীব বুঝাইতেছে।

(১০) আত্মা—কার্য্যের প্রবর্ত্তক। যিনি জীতচিত্ত, তাঁহার আত্মা সমানুষ্ঠান করতঃ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, এজন্য জীতচিত্ত ব্যক্তির আত্মা, বন্ধু। আর যাঁহার আত্মা আত্মবশীভূত নহে, তাঁহার আত্মা দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া পাপার্জ্জন ও পরিণামে নরক প্রাপ্ত হয়, এজন্য তাঁহার আত্মা, শত্রু।

* কর্ম্ম কামেভ্যো ইতি পাঠান্তর।

যে আমাকে (কৃষ্ণকে) সর্ব্বত্র সর্ব্ব (বস্তুতে) দর্শন করে, আমি তাহার অসাক্ষাতে বা সে আমার অসাক্ষাতে নাই।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতিযোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরিমোমতঃ॥ ৩২

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আপনার সুখদুঃখ ও পরের সুখদুঃখ একরূপ বিবেচনা করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী।

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্য চেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিন॥ ১৪

নিত্য শুদ্ধচিত্তে যে আমাকে স্মরণ করে, হে পার্থ! সেই নিত্য যোগযুক্তাত্মা আমাকে (হরিকে) অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকে

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও জীবের পুনরাবর্ত্তন সম্ভবে, কিন্তু কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর (জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না।

দশম অধ্যায়।

জগতের প্রত্যেক বৈভাগিক শ্রেষ্ঠবস্তুর স্বরূপ শ্রীহরি বর্ত্তমান। এক্ষণে কোন্ বিভাগের কোন্ পদার্থ শ্রেষ্ঠ, তাহা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশ্রয় স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্য্যোতিষাং রবিরংশুমান।
মরিচীর্মরুতামস্মি নক্ষত্রানামহং শশি॥ ২১
বেদানাং সামবেদোস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥২২
রুদ্রানাং সঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষ রাক্ষসাং।
বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহং॥ ২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিং।
সেনানিনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪
মহর্ষিণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরং।
যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥২৫
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথং সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ॥২৬
উচ্চৈশ্রবাসমাস্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবং।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপং॥২৭
আয়ূধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্প সর্পনামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগাণাং বরুণো যাদমামহং।
পিতৃণামর্য্যমাশ্চাস্মি যমঃ সংযমতামহং॥ ২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহং।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাং ॥ ৩০
পবন পবতামস্মি রামঃ সস্ত্রভৃতামহং।
মৎস্যানাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসমাস্মি জহ্নবী ॥ ৩১
সর্গানামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈ বাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহং ॥ ৩২
মৃত্যুঃ সর্ব্ব হরশ্চাহ মস্তুবশ্চ ভবিষ্যতাং।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধাধৃতিঃ ক্ষমা ৩৪
দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্মি নামহং ॥।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্বং সত্বরতামহং ॥ ৩৫

হে অর্জ্জুন! আমি আত্মারূপে সর্ব্বভূতস্থিত, এবং আদ্য, মধ্য ও অন্ত স্বরূপ। আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিব মধ্যে অংশুমান, মরুৎগণেব মধ্যে মবিচী, নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্র, দেবেব মধ্যে বাসব, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন, এবং ভূতগণের চৈতন্য স্বরূপ রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষগণের মধ্যে ধনেশ, বসুব মধ্যে অগ্নি ও পর্ব্বতেব মধ্যে সুমেরু। আমি সেনাপতিব মধ্যে কুমাব, নদীর মধ্যে সাগর, পুরোহিতেব মধ্যে বৃহস্পতি। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে শুক্র, অক্ষরের মধ্যে প্রণব, যজ্ঞের—জপ এবং স্থাবরের মধ্যে হিমালয় স্বরূপ। আমি বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিব মধ্যে নাবদ, গন্ধর্ব্বগণেব মধ্যে চিত্ররথ, এবং সিদ্ধগণেব মধ্যে কপিল স্বরূপ। আমি অশ্বের মধ্যে ক্ষীরোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা হস্তীব মধ্যে ঐরাবত, এবং মনুষ্যের মধ্যে নরাধীপ। আমি

অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, ধেনুর মধ্যে কামধেনু, সর্পের মধ্যে বাসুকী, ও প্রজাসৃজনে কন্দর্প স্বরূপ। নাগ মধ্যে আমি অনন্ত, জলদেবতা মধ্যে বরুণ, এবং পিতৃ লোকের মধ্যে অর্য্যমা। আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, বশীকরণে—কাল, মৃগের বিক্রমে সিংহ এবং পক্ষীর মধ্যে গরুড় স্বরূপ। বেগবানের মধ্যে পবন, অস্ত্রধারীগণের মধ্যে (ভৃগু) রাম, মৎস্যের মধ্যে মকর, এবং নদীর মধ্যে জাহ্নবী। সৃষ্টির মধ্যে আমি আদি, মধ্য ও অন্ত। হে অর্জ্জুন! বিদ্যার মধ্যে আমি আত্মবিদ্যা এবং বেদের মধ্যে আমি সাম বেদ। ভূতের মধ্যে আমি সর্ব্ব সংহারক কাল, এবং ভবিষ্য জীবজন্তুর উৎপাদক, নারীগণের মধ্যে শ্রী, কীর্ত্তি, বাক্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। বঞ্চকের মধ্যে আমি পাশক্রীড়া, তেজস্বীগণের মধ্যে আমিই তেজঃ স্বরূপ। ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসা, সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব এবং জয়াভিলাষীর জয় স্বরূপ হই।

একাদশ অধ্যায়।

বিশ্বেশ্বর—বিশ্বরূপ। এই বিশালজগতই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন,—

অনেক বক্ত্র নয়নমনেকাদ্ভুত দর্শনং।
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং॥ ১০

সেই অদ্ভুত দর্শন (পুরুষ) নানা বক্ত্র, নানা নয়ন, এবং নানাবিধ আভরণ ও অস্ত্রে সুশোভিত।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্য গন্ধানুলেপনং।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখং॥ ১১

তিনি দিব্যমাল্যবস্ত্রাদি ধারী, এবং দিব্য গন্ধানুলেপিত (গাত্র) তাঁহার সকলই আশ্চর্য্যজনক। (তিনি) অনন্ত এবং নানা মুখবিশিষ্ট।

বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন বলিতেছেন ;—

তমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
তমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্ম গোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতোমে ॥ ১৭

হে বিশ্বনিধান! তুমি মুমুক্ষগণেরই বেদিতব্য, তুমি অব্যয়, শাশ্বত, ধর্ম্মরক্ষক, সনাতন এবং পুরুষ প্রধান।

অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া সানন্দে দেখিলেন ;—

"যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা,
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রানি সমৃদ্ধ বেগাঃ ॥ ২৯

পতঙ্গ, জানিয়াও যেমন মরিবার জন্যই অগ্নিতে পতিত হয়, সেইরূপলোক সকল তোমার (কৃষ্ণের) বদনবিবরে মরিবার জন্যই পতিত হইতেছে।

এই টুকু কৃষ্ণের উপদেশের ফল। অর্জ্জুন দেখিলেন—কাল সহকারে কোটী কোটী জীব জন্তু মরিতেছে—জন্মিতেছে। বালক, যুবা, বৃদ্ধ অনন্ত পথে অনবরত যাতায়াত করিতেছে॥

ইহা দেখিয়াই অর্জ্জুন বুঝিলেন "জীব মরিয়াই আছে। প্রাণী সংহার—মরাকে মারা মাত্র।" এই বুঝিয়াই অর্জ্জুন পুনরায় অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন।

ভক্তিই মুক্তির এক মাত্র সাধন। ভক্তি সম্বন্ধে অর্জ্জুন কহিতেছেন :—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চার্চ্চয়া।
শক্য এবম্বিধোদ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩

বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও অর্চ্চনায় যাহা দেখা যায়না, (তুমি আজ) আমাকে সেইরূপ দেখাইলে।

অর্জ্জুন বাক্যের প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ কহিতেছেন :—

ভক্ত্যাত্বনন্যায়া শক্য অহমেব বিধোর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪

হে পরন্তপ! যে আমাকে (একমনে) ভক্তি করে, হে অর্জ্জুন! সে আমার এই অপূর্ব্বমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মোক্ষধামে প্রবেশ করে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

এক্ষণে ভক্ত কে? কোন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ভক্তশ্রেণিতে পরিগণিত হওয়া যাইতে পারে তাহাই কথিত হইতেছে। কৃষ্ণ কহিতেছেন :—

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসিনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্খতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

সমঃ সনৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শিতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃসঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌণী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥ ১৯
সেতু ধর্ম্মামৃতংমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্ধবানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ॥

যে ব্যক্তি নিরপেক্ষা, শুচি, দক্ষ, ব্যথাশূন্য উদাসীন, এবং উদ্যোগপরিত্যাগী, সেই আমার ভক্ত, এবং প্রিয়। যে ব্যক্তি হর্ষ এবং অনিষ্টে বিষাদশূন্য, শোক, আকাঙ্খা, শুভ এবং অশুভ পরিত্যাগী সেই ভক্তিমান ব্যক্তিই আমার প্রিয়। শত্রু, মিত্র, মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ যাহার নিকট সমান, এবং যে আসক্তি বিবর্জ্জিত ; স্তুতি ও নিন্দা যাহার নিকট এক জ্ঞান, যে সংযত বাক্ সেই স্থিরমতি ভক্তিমান নরই আমার প্রিয়। যে এই অমৃত তুল্য ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হইয়া, ঈশ্বর উপাসনা করে, সেই ভক্ত আমার অতীব-প্রিয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব আলোচিত হইতেছে।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্যানাদি উভরপি।
বিকারংশ্চ গুণাশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান॥ ১৯

পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি, কেবল প্রাকৃতিক গুণে (পুরুষ) বিকৃত হইয়া থাকেন।

কার্য্য কারণে কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২০

কার্য্যকারণে কর্ত্তৃত্ব হেতু প্রকৃতি, এবং সুখ ও দুঃখ ভোগ হেতু পুরুষ কহে।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণোসঙ্গোহস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু ॥ ২১

প্রকৃতি হইতে দেহের উৎপত্তি এবং তাহাতে সদসৎ ফল ভোগী হন, পুরুষ নির্গুণ অবস্থায় (দেহকে আশ্রয় করিয়া) অবস্থান করেন।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃসহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ২৩

যে ব্যক্তি, এই পুরুষ ও প্রকৃতির গুণসমূহ জ্ঞাত থাকে, *সে সর্ব্বথা বর্ত্তমান থাকিয়াও, পুনরায় তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

---

* ইতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আত্মা নিষ্কলঙ্ক এবং বিকার-শূন্য, কেবল প্রকৃতির সম্মীলনে দেহাবলম্বনে যতদিন অবস্থান করেন, ততদিন তিনি দেহের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেও নির্ব্বিকার [illegible] থাকেন। আত্মা—পুরুষ, দেহ—প্রকৃতি। সুখ দুঃখাদি সাংসারিক যাবতীয় তন্নিমিত্ত দেহই ভোগ করিয়া থাকেন, পরন্তু আত্মা সাংসারীকের শরীরে অবস্থান করিয়াও দেহীর ইহ পরকালের ফলাফল ভোগী নহেন। সর্ব্বদাই তিনি অবিকৃত। তবে দেহে অবস্থান কালে, তাঁহার বিকৃতভাব উপলব্ধি হয় সত্য, কিন্তু তাহা প্রকৃত বিকৃতি নহে, প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র।"